আজাদ হিন্দ্‌ গ্রন্থমালার একাদশ বই

বিপ্লবী কানাইলাল

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক, ১৩৫৩
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস,
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
দেড় টাকা

ভূমিকা

[illegible] শৃঙ্খল-মুক্ত ভারতের বিষ-মুক্ত বাতাসে প্রাণের নিঃশ্বাস নিচ্ছে সদ্যজাত [illegible]ত, উৎসব করছে। বহু যুগ পরে ভারতের আকাশে আলো দেখছি; বহু বিগত প্রাণ-আত্মার জ্যোতি বুঝি বিকীর্ণ হচ্ছে অলক্ষ্য হতে। যাঁরা অকাতরে আত্মাহুতি দিয়ে গেছেন স্বাধীনতার পূত যজ্ঞে তাঁদের আজ তাই স্মরণ করি। দুঃখের কথা, তাঁদের অনেকেই আমাদের কাছে অপরিচিত, অনেকের পরিচয় স্মৃতিগর্ভে বিলীন। সেই অতীতের পৃষ্ঠা হতে তাঁদের সবার সমক্ষে আবার উজ্জ্বল করে তোলার দায়িত্ব গ্রহন করেছেন প্রকাশক। তাঁদের কর্তব্যবোধকে ধন্যবাদ জানাই। বিপ্লবী কানাইলাল আজে ইতিহাসের মানুষ। কিছু পরিচয়-লিপি ছিল; বিদেশী রাজ-শক্তির রোষ-বহ্নিতে ভস্ম হয়ে গেছে। সুখের কথা ভস্মের ভিতরও আগুন থাকে। সেই আগুনকে চিনিয়ে দেবার কাজে সাহায্য করেছেন শিল্পী নরেন মল্লিক। তিনিও ধন্যবাদার্হ।

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

আজাদ-হিন্দ্ গ্রন্থমালা

১। **দিল্লী চলো**—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

২। **মুক্তি-পতাকাতলে**—মেজর নীহাররঞ্জন গুপ্ত

৩। **নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ**—জ্যোতিপ্রসাদ বসু

৪। **আরাকান ফ্রন্টে**—ডাঃ শান্তিলাল রায়

৫। **বিপ্লবীর আহ্বান**—মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু

৬। **ভারত ছাড়**—নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ

৭। **জাপানী বন্দী শিবিরে**—মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসু

৮। **ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী**—গোপাল ভৌমিক

৯। **বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ**—ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

১০। **লেখপুঞ্জ**—নেতাজী সুভাষচন্দ্র, মেজর বি. এম. পট্টনায়ক, জেনারেল মোহন সিং, এন. রাঘবন, মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানি ইত্যাদি।

১১। **বিপ্লবী কানাইলাল**—জ্যোতিপ্রসাদ বসু

১২। **জার্ম্মানীতে নেতাজী**—

১৩। **বিপ্লবী রাসবিহারী**—জ্যোতিপ্রসাদ বসু

অন্তিম শয়ানে কানাইলাল

কানাইলালের মাতা ব্রজেশ্বরী দেবী

বিপ্লবী কানাইলাল

বাংলার অগ্নিযুগ

ভারত আজ শৃঙ্খলমুক্ত। এই শৃঙ্খল মুক্তির পশ্চাতে রয়ে গেল বহুবিস্তৃত এক সংগ্রামের ইতিহাস। এ সংগ্রামের সৈনিকদের কোন সংখ্যা নেই, অনেকের নেই কোন পরিচয়; অনেকের নাম পর্যন্ত জানা নেই আমাদের। তবু, আমরা এদের সবাইকে যেন জানি, এদের অব্যক্ত আশীর্বাদ নিঃশব্দে যখন ঝরে পড়ে নবীন ভারতের উন্নত শিরে তখন সেই প্রাচীন পূর্ব-গতদের সকলকে যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আজ থেকে শত বর্ষ পরে, ভারতের আকাশ যেদিন খাদ-হীন সূর্যালোকে হবে উদ্ভাসিত, ভারতের বাতাসে থাকবে না পরবশতার বিষ-জর্জরতার শেষ চিহ্নটুকুও, ভারতের মাটিতে পাওয়া যাবে না বহুজনের ক্ষরিত রক্তের এতটুকু ক্লেদ, সেইদিন স্বাধীন ভারতের শিশু,- -নিশীথে নিস্তব্ধ অবকাশে শুনবে এক রূপকথা। শুনবে বহু দেবকুমারের জয়োদ্দীপ্ত কাহিনী। শুনে রোমাঞ্চিত হবে, পুলকিত হবে স্বাধীন ভারতের নির্মল শিশুর দল। আজ মুক্তি ও পরবশতার যুগান্তকারী সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, দুশো বছরের দাসত্বের অব্যর্থ পরিণামের মধ্যে—ভেদ, বিদ্বেষ অরাজকতার

রক্ত-কর্দমে ডুবে—আসন্ন দুর্ভিক্ষের করালছায়া-সমাকীর্ণ
আকাশের নীচে একবার সেই রূপকথার রোমাঞ্চকে স্মরণ
খ্যাত অখ্যাত যারা নিঃশেষে আপনাকে উৎসর্গ করে
যাদের মধ্যে অনেকে আজও অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে
আমাদের চারপাশে তাদের এই যুগসন্ধিক্ষণে একবার
করি। মীর্জাফর আর উমিচাঁদের কলঙ্ককে যারা বুকে
দিয়ে চিরতরে মুছে ফেলবার প্রথমসঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল তাদের
স্মরণ করি। স্মরণ করি রক্তাক্ষরে লিখিত বাঙ্গলার অগ্নিযুগের
ইতিহাসকে। আগামী দিনের পৃথিবীতে যে ইতিহাস হবে
সেরা রূপকথা।

প্রাদেশিকতা স্বীকার না করলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে
ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূত্রপাত এই বাঙ্গলাদেশে—
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিমা, বিবেকানন্দের ধ্যান ও রবীন্দ্রনাথের তীর্থ—
বাঙ্গালীর মাতৃভূমি এই বাঙ্গলাদেশে। ১৯০৫ সালে লর্ড
কার্জন প্রস্তাবিত বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যবস্থার প্রতিবাদকল্পে স্বদেশী
যুগের সুরু। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা অরবিন্দ ও বারীন্দ্র
ঘোষ, প্রধান নায়ক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
ও বিপিনচন্দ্র পাল। অনুপ্রেরণার উৎস—'বন্দেমাতরম্'
'কর্মযোগী,' 'সন্ধ্যা' 'নবশক্তি', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকা। এই
সব পত্রিকা ছাড়া কতগুলি বিশেষ বিশেষ বই তখন যুবকদের
মধ্যে বহুল প্রচলিত। যেমন,—'মুক্তি কোন পথে?' 'বর্তমান
রণ-নীতি,' 'কাঃ পন্থাঃ,' বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' প্রভৃতি।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর রণক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য
ত হয়েছিল। তার চোদ্দ বছর পরে রাজা রামমোহনের
নো জন্ম। রামমোহনের জন্ম থেকে বিবেকানন্দের মৃত্যু
প্রা াল)—এই কিছু বেশি একশত বছর বাঙ্গলাদেশের
ক াল। ফরাসী বিপ্লবে আমরা যেমন পেয়েছি রুশো,
ার, কনডরসেট, টারগট প্রভৃতিকে তেমনই এই শতবর্ষ
ঙ্গলাদেশ জন্ম দিয়েছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র
বিবেকানন্দ, কেশব সেন, প্রভৃতি সংস্কারককে। এঁরা সমবেত
ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে জাতি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন, সকল
প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সুর ধ্বনিত করে তুলেছেন।
বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরবর্তী অধ্যায় অগ্নিযুগের রোমাঞ্চিত
ইতিহাস। আয়োজন সম্পূর্ণ—কেবল নায়কের প্রয়োজন। সে
নায়ক দেখা দিলেন অরবিন্দ বারীন্দ্রের রূপ নিয়ে।

অরবিন্দ-বারীন্দ্রের নেতৃত্বে বিরাট বিপ্লবীদল গঠনের পূর্বে
কয়েকটি ছোট ছোট দলের সৃষ্টি হয়েছিল বাঙ্গলায়। প্রথম
দল রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন
দাস, ব্যারিষ্টার তারক পালিত প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। আরও
একটি শক্তিশালী দল—রাজনারায়ন বসু, দ্বিজেন ঠাকুর প্রভৃতি
সংগঠিত হিন্দু মেলা। ঠিক এই সময়েই, ১৯০২ সালে
কলিকাতায় ব্যারিষ্টার পি মিত্র 'অনুশীলন সমিতি' নামে একটা
দল গঠন করেন। বাহ্যতঃ এটা একটা ব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্র
হলেও ভিতরে ভিতরে এর উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী দল গড়ে তোলা।

অনুশীলন সমিতির মত আর একটি সমিতি ছিল যার নাম 'আত্মোন্নতি.' এর সংগঠক মধ্য কোলকাতার বিপিন গাঙ্গুলী ও অনুকূল মুখার্জী। বাঙ্গলাদেশের মত মহারাষ্ট্রেও কয়েকটি সমিতি গঠিত হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের নেতা ছিলেন ... ভ্রাতৃদ্বয় ও চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়। এই সময়েই কাথিওয়... স্বামী কৃষ্ণ বর্মা লণ্ডনে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি লণ্ডনের বাসিন্দা ম্যাডাম কামা নামে এক ধনী পার্শী... লণ্ডনে থেকে স্থানীয় ভারতীয় যুবকদের যথেষ্ট সাহায্য করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে আরও দুইজনের নাম করতে হয়। তাঁরা হলেন যতীন বন্দোপাধ্যায় ও শশী রায় চৌধুরী। যতীন বন্দোপাধ্যায়ের গুপ্ত নাম ছিল 'উপাধ্যায়।' তিনি এই ছদ্মনামে বরোদারাজ্যের ঘোড়-সওয়ার বাহিনীতে যোগদান করেন এবং সামরিক কায়দাকানুনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। বলতে গেলে তিনিই ছিলেন গুপ্ত-সমিতি গঠনের মন্ত্রণাদাতা। অরবিন্দ, বারীন, যতীন (বাঘা), সর্দার অজিত সিং প্রভৃতি সকলেরই পরামর্শ ও উৎসাহদাতা ছিলেন এই 'উপাধ্যায়' মহাশয়। পরে অবশ্য তিনি সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন ও নাম নেন নিরালম্ব স্বামী। শশী চৌধুরী সামান্য স্কুলমাষ্টার হয়েও গোপনে ও নীরবে যে ভাবে কাজ করে চলেছিলেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে স্বাদেশিকতায় উদ্দীপিত করে তোলা। তাই গণ সংযোগ ও গণশিক্ষার আদর্শে তিনি কোলকাতার চারপাশে শ্রমিক

মজতুরদের জন্য বহু নাইটস্কুল বা নৈশবিদ্যালয় গড়ে তে[illegible]ন। এই পথে তিনি প্রথমে পি মিত্র এবং পরে বাঘা [illegible] ও যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর [illegible] প্রচারিত না হলেও যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ছিল। যাই [illegible] এই বহুমুখী স্রোত বাঙ্গলার দিকে দিকে প্রবাহিত [illegible] অন্তরে অন্তরে ফল্গু-স্রোতের মতই এক মুখী হয়ে [illegible] হচ্ছিল। সে পথ বিপ্লবের পথ। ১৯০৫ সনে বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ আন্দোলন এই বহু মুখী স্রোতকে সংহত ও একমুখী করে দিল। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন পূরামাত্রায় চলল। তারপর ১৯০৮ সালের ক্রিমিন্যাল ল' এমেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্টের সাহায্যে সমিতি দলন সুরু হল। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাঙ্গলার জেলায় জেলায় সমিতি গঠন সুরু হয়ে গেছে। উত্তর বঙ্গে যতীন রায়ের নেতৃত্বে এক দল, ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যের নেতৃত্বে সুহৃদ ও সাধনা সমিতি. বরিশালে অশ্বিনী দত্ত ও সতীশ মুখার্জীর (পরে যিনি প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী নামে খ্যাত) নেতৃত্বে স্বদেশ বান্ধব সমিতি এবং পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রতি জেলায় অনুশীলন সমিতির শাখা প্রশাখা গড়ে উঠেছে।

অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর ছোট ভাই বারীন্দ্রের শৈশব কেটেছে ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডে তাঁরা মানুষ হয়েছেন, ভাল বাঙ্গলা জানেন না। এঁরা ভারতে এসে রইলেন বরোদায়। বরোদায় অরবিন্দ শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু মনে মনে এঁরা ইতিমধ্যেই বিপ্লবের

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। এই দীক্ষা দিয়েছেন ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্যা। গিরি ঙ্কর চৌধুরী এ-সম্পর্কে লিখেছেন—"ভগিনী নিবেদিতার ত অরবিন্দের বরোদায় যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন নি বিপ্লবী, অরবিন্দও বিপ্লবী। দুই বিপ্লবীর সাক্ষাৎ অবশ্য রোমাঞ্চকর ঘটনা। এই প্রথম সাক্ষাৎ বৃথা হয় নাই। অ যেদিন চন্দননগরে পলায়ন করেন, সেদিন রাত্রির অন্ধকা বোসপাড়া লেনে, নিবেদিতার বাড়ী গিয়া পলায়নে তাঁহার সমর্থন লাভ করিয়া, শেষ সাক্ষাৎ করিয়া যান। বৈপ্লবিক মতবাদ ও কর্মক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে অরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার নিকট যতটা এবং যেরূপ সহানুভূতি পাইয়াছেন তাহা আর কাহার নিকট হইতে—এমন কি মিঃ পি মিত্রের নিকট হইতেও পান নাই।...বৈপ্লবিক সকল দলই ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে সমান সহানুভূতি ও প্রেরণা পাইয়াছে।"

মাত্র ২২ বৎসর বয়সে বারীন্দ্র কোলকাতায় প্রথমবারের মত গুপ্ত-সমিতি গঠন করতে আসেন। কিন্তু প্রথমবারে এসে বারীন্দ্র উপলব্ধি করেন যে কোন সুসংবদ্ধ উপায়ে বৈপ্লবিক ধারাকে চালিত করবার সময় তখনও হয় নি। তাই সেবার একরকম ব্যর্থ হয়েই তিনি বরোদা ফিরে যান। এবং তারপরই পি মিত্র অনুশীলন-সমিতি গঠন করে একটা শক্তিশালী ও কার্যকরী দল গড়ে তোলেন। এর পর থেকেই সারা দেশ

জুড়ে কাজ চলতে থাকে। অরবিন্দ ও বারীন্দ্র কোলকাতায় আসেন। অরবিন্দকে কেন্দ্র করে, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কাব্যবিশারদ প্রভৃতি জননায়কগণ তাঁদের লেখনীর সাহায্যে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে থাকেন। আর বারীন্দ্রকে কেন্দ্র করে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের নিয়ে কর্মী গড়ে উঠতে থাকে—উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কানুনগো, উল্লাসকর দত্ত, ভূপেন দত্ত…। এই তরুণদের কাজ ছিল বোমা তৈরী করা ও যুগান্তর কাগজ চালানো। সকলের চেয়ে বেশী অনুপ্রেরণা পাওয়া যেত সম্ভবতঃ অসাধারণ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা ও লেখা থেকে। মধ্যভারতের বালগঙ্গাধর তিলক, উত্তরভারতের লালা লাজপৎ রায় এবং পূর্বভারতের বিপিনচন্দ্র পাল এই তিন মহারথকে বলা হত 'লাল বাল পাল'! ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজি তখন আন্দোলন চালাচ্ছেন। সেখানকার ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করে অসহযোগ আন্দোলন ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালাচ্ছেন। বিপিন পালও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সমর্থন করেন। তবে গান্ধীজি বিপিন পালের চেয়েও বেশী অগ্রসর। বিপিন পাল বক্তৃতা করতেন, লিখতেন আর গান্ধীজি কারাবরণ করে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ বলতে কি বোঝায়! বিপিন পাল একাধিকবার বলেছেন, গুপ্ত-সমিতির বিপ্লবকে তিনি কাপুরুষতার ন্যায় ঘৃণা করেন এবং গান্ধীজিও বলেছিলেন I do

not appreciate cowardice. কিন্তু অরবিন্দ এলেন এক নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে। বিপিনচন্দ্র লিখেছিলেন যে গুপ্তহত্যা ষড়যন্ত্র শুধু রাজ-অত্যাচারই ডেকে আনে। আর অরবিন্দ ঠিক উল্টা লিখলেন—wanted more repression বা আরও অত্যাচার চাই।

সাত বৎসর বয়সে অরবিন্দ বিলেত যান। কেমব্রিজে থাকবার সময় কুড়ি বৎসর বয়সেই বিপ্লব ও বোমা তৈরী পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। ২১ বৎসর বয়সে দেশে ফিরেই তিনি তখনকার বুর্জোয়া কংগ্রেসের নিবেদননীতির তীব্র সমালোচনা সুরু করে দেন। তিনি ফরাসী বিপ্লবের কথা বললেন জনসাধারণকে—প্রোলিটারিয়েটকে কংগ্রেসের মধ্যে আনার কথা বললেন। অরবিন্দের দাবী সোজা—পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্যেই! এই দাবী ১৯৪২ সালের কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' দাবীরই নামান্তর মাত্র। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কংগ্রেস ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী কিন্তু অরবিন্দ একাধারে হিন্দু ও জাতীয়তাবাদী। বঙ্কিমচন্দ্র যে মাতৃভূমিকে বন্দেমাতরম্ বলে পূজো করলেন অরবিন্দও সেই দেশকে মাতৃরূপে চিন্তা করলেন—'the mother in me!' তাছাড়া জামালপুরে মুসলমান গ্রামবাসীরা যখন হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করল তখন দেখা গেল সন্ত্রাসবাদীরা গরম হয়ে উঠেছেন। বরোদার 'ভবানী মন্দিরের' সাধক অরবিন্দের মনে গোড়া থেকেই ধর্মের ছাপ আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের

আনন্দমঠের প্রভাব আছে। তাই অরবিন্দ যখন নেতৃত্বে নামলেন তখন তাঁর এক হাতে তরবারী অন্য হাতে গীতা। দেখা যাচ্ছে অরবিন্দ গোঁড়া হিন্দু। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় (২২ শে আগষ্ট ১৯০৭) অরবিন্দ লিখছেন—"Can I be false to the fundamental message of my religion my civilisation and its philosophy? I am a Hindu. I am a nationalist." যাই হোক অরবিন্দ যে প্রথম বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দেশকে দীক্ষিত করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে বরোদা থেকে বাংলা দেশে এসে মেদিনীপুরে নিজ হাতে বন্দুক ছোড়া শিখিয়ে তিনি গুপ্ত সমিতির প্রবর্তন করেন। ছোট ভাই বারীন্দ্র অরবিন্দের অনুগামী মাত্র। পূর্বেই বলেছি যে বারীন্দ্রের দলের হাতে ছিল যুগান্তর পত্রিকা। এই যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ভূপেন দত্ত মশাই (অধুনা ডাঃ ভূপেন দত্ত)। প্রথমে অরবিন্দের চেষ্টায় ছোটলাট ফুলারকে বধ করবার চেষ্টা হয়েছে, এবং ব্যর্থ হয়েছে। এই চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর অরবিন্দ দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ রূপে এবং বন্দে-মাতরম্ পত্রিকার সম্পাদকরূপে যোগদান করলেন। যুগান্তর পত্রিকায় কয়েকটি বিপ্লবমূলক লেখা প্রকাশিত হওয়ায় ভূপেন দত্ত পুলিসে ধরা পড়লেন। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় তার ইংরাজী তর্জমা বার হল (বন্দেমাতরম্ পত্রিকা ইংরাজীতে প্রকাশিত হত) এবং সেই সঙ্গে India for the Indians নামে এক

প্রবন্ধ লিখলেন অরবিন্দ। এই অপরাধেই অরবিন্দ ধরা পড়লেন। দেশময় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কবিতা—'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' রচনা করলেন এবং সে কবিতা বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় ছাপা হল।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় সম্পাদক সজ্ঞে বিপিনচন্দ্রের নাম ছিল বটে কিন্তু অরবিন্দের নাম অপ্রকাশিত ছিল। কাজেই সম্পাদক হিসাবে বিপিনচন্দ্র ও সন্দেহভাজন হিসাবে অরবি[illegible] উভয়েরই বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বার হল। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের আদালতে বিচার সুরু হল। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রবর্তক ও প্রথম প্রচারক বিপিনচন্দ্র প্রকাশ্য আদালতে বললেন—I have conscientious objections against taking part in a prosecution which I believe to be unjust and injurious to the cause of popular freedom and the interests of public peace. এই মামলায় কোনও কথা বলতে, কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে তাঁর বিবেকে বাধে—বিপিনচন্দ্র প্রকাশ্য ভাবে তা বললেন। এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যেই এক সক্রিয় প্রতিরোধ ঘটে গেল। ঐ দিন আদালত প্রাঙ্গনে জমায়েত জনতাকে পুলিশ বলপ্রয়োগে সরাবার চেষ্টা করছিল। ১৪ বৎসর বয়সের সুশীল সেন মার খেয়ে প্রহাররত ইন্সপেক্টর হেনরীকে পালটা আক্রমণ করে বসল। অবাক কাণ্ড! সামান্য বালকের এত সাহস! কিংসফোর্ড সাহেব বিচার

করলেন এই অপরাধের! তাঁর আদেশে ১৪ বৎসর বয়সের বালককে ১৪ ঘা বেত্র দণ্ডে ক্ষত বিক্ষত করা হল। এই অত্যাচার নিষ্ফল হল না। সুশীল সেন যোগ দিল বারীন্দ্রের কারখানায় বোমা তৈরী করবার জন্যে। অরবিন্দ যে লিখেছিলেন—wanted more repression—সে কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হল। হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' নামক বইখানিতে লিখছেন—বোমা দিয়ে মানুষ মারবার কেরদানী শেখাবার জন্য বারীন্দ্রের নিকট দু'একজন যুবক চেয়েছিলাম। প্রথমে পাঠিয়েছিল শ্রীমান সুশীলকে। সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবকে মারবার আদেশ দিয়েছিলেন কর্তাবা।

বন্দেমাতরম্ সম্পর্কিত মোকর্দমার পরই বারীন্দ্রের দল যুগান্তর কাগজ ছেড়ে বোমার কারখানা স্থাপনে আত্মনিয়োগ করল। অরবিন্দের নেতৃত্বে যখন ফুলার বধের চেষ্টা হয়েছিল তখন গুপ্ত সমিতির আস্তানা ছিল চাঁপাতলায়। বারীন্দ্রের দলের আস্তানা হল মানিকতলা মুরারীপুকুরে। এই আড্ডা থেকেই ছোটলাট ফ্রেজার, চন্দন নগরেব মেয়র ও মিঃ কিংসফোর্ডের বধের গোপন চেষ্টা চলে এবং ব্যর্থ হয়। চাঁপাতলা থেকে ক্রমশঃ এইভাবে আস্তানার পরিবর্তন ও বিস্তার হয়। (১) চাঁপাতলা—১৯০৬ মার্চ ১৯০৭ অক্টোবর—১ বৎসর আট মাস। (২) মানিকতলা ১৯০৭ নভেম্বর—১৯০৮ এপ্রিল ৬ মাস। (৩) বৈদ্যনাথ (শীলস লজ)—১৯০৮ জানুয়ারী—

এপ্রিল—৪ মাস। (৪) ভবানীপুর—১৯০৮ মার্চ—এপ্রিল ২ মাস। (৫) শ্যামবাজার (গোপীমোহন দত্ত লেন)—১৯০৮ এপ্রিল—১ মাস। বারীন্দ্রের মানিকতলায় আস্তানা স্থাপন সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 'নির্বাসিতের আত্ম-কথায়' লিখেছেন—"বারীন্দ্র বলিল—'এরূপ বৃথা শক্তির ক্ষয় করিয়া লাভ নাই। বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া গভর্ণমেন্টকে ধরাশায়ী করিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। এতদিন যাহা প্রচার করিয়া আসিলাম, তাহা এইবার কাজে করিয়া দেখাইতে হইবে, এই সঙ্কল্প হইতেই মাণিকতলা বাগানের সৃষ্টি।

'মাণিকতলায় বারীন্দ্রের একটি বাগান ছিল। স্থির হইল যে একটা নূতন দলের উপর যুগান্তরের ভার দিয়া যুগান্তর অফিসের জনকতক বাছাই বাছাই ছেলে লইয়া ঐ বাগানে একটা নূতন আড্ডা গড়িতে হইবে।'

কানাইলালের জীবনী লিখতে বসে এত অবান্তর কথা কেন আসে, এবং তার মধ্যে কানাইলালের নামোল্লেখ পর্যন্ত কেন হয় না, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এত কথা এইজন্যেই বলতে হয় যে, বাংলার অগ্নিযুগ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা না থাকলে কানাইলালের জীবনী উপলব্ধি করা শক্ত। কারণ, কানাইলাল নেতা নয়, সেনাপতি নয়—সে সৈনিক। বিপ্লবী-যুগে একজন সৈনিকেব পক্ষে কতখানি নিষ্ঠা, ত্যাগ ও সংযমের প্রয়োজন হত কানাইলাল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাই সৈনিক

কানাইলালকে বুঝতে হলে, জানতে হলে, আগে জানতে হবে তার পারিপার্শ্বিককে। তার নেতাদের, যে আবহাওয়ায়, যে অবস্থায়, যে মানসিক উত্তেজনার মধ্যে কানাইলালের মত সৈনিকেরা কাজ করে গেছে, তাকে কল্পনা করা আজ শক্ত। তাই, সে যুগের হাওয়ার পরিচয় কিছু জানা দরকার। এই অধ্যায় সেই বিগত যুগের আবহাওয়ারই আভাষমাত্র।

কিশোর কানাই

হিন্দুজাতির কাছে জন্মাষ্টমী একটি বিশেষ উৎসবের দিন। সেই দিন অত্যাচারী কংসকে বিনাশ করবার জন্যে মহাপুরুষ, মহাবীর্যবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পর যুগে যুগে এই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে আসছে হিন্দু-ধর্মাবলম্বীগণ। ১৮৮৯ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর ছিল জন্মাষ্টমী ব্রত পালনের দিন। সবার অলক্ষ্যে, অতি সাধারণভাবে সেদিন চন্দননগরে এক শিশু ভূমিষ্ঠ হল। তখন কে জানতো, এই শিশু একদিন জন্মাষ্টমীর পূত ব্রতের উদযাপন করে যাবে রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে! কে আনতো কংসের কারাগারে জন্ম নেবে পুরুষোত্তম।

জন্মাষ্টমীর দিন জন্মগ্রহণ করায় কানাইলালের নাম রাখা হয় কানাইলাল। কানাইলালের অগ্রজের নাম ছিল আশুতোষ। শোনা যায় আশুতোষের সঙ্গে মিলিয়ে কানাইলালের নাম রাখা হয় সর্বতোষ। পরে এই নাম পরিবর্তন করা হয়। কানাই-

লালের বাবা বোম্বাই সহরে এক অফিসে কাজ করতেন। তাই কানাইলালের শৈশব বোম্বাইতেই কাটে। সেখানে আর্য হাই স্কুলে কানাইলাল পড়াশোনা করতেন। কানাইলাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। পড়ার বই তাঁকে খুব বেশি পড়তে দেখা যেত না। পরীক্ষার সময় তিনি পায়চারী করতে করতে একবার বা দুবার বইগুলি পড়ে যেতেন। তার ফলেই দেখা যেত তিনি প্রথম কি দ্বিতীয় হয়েছেন। শুধু ছেলেবয়সেই নয়, কলেজের পরীক্ষাতেও তাঁকে ঐভাবে পড়াশোনা করতে দেখা গেছে। যখন তিনি বি-এ পরীক্ষা দেন তখন বিপ্লবযজ্ঞে তিনি আত্মাহুতি দিয়েছেন। তবুও দেখা গেছে তিনি অতি সহজেই বি-এ পরীক্ষা পাশ করে গেছেন। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট তাঁর ডিগ্রি কেড়ে নিয়েছিল। সে কথা যথাসময়ে বলা যাবে। কানাইলালের তীক্ষ্ণ মেধা ও বিরাট স্মৃতিশক্তি স্কুলের শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং কানাইলাল অতি সহজেই তাঁদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। শিক্ষকেরা তাঁকে অনেক বই স্বেচ্ছায় উপহার দিতেন এবং কানাইলাল পড়ার বই না পড়ে সেই সব বই খুব বেশি পড়তেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি নিজেকে এইভাবে গড়ে তুলেছিলেন।

চার বৎসর বয়সে কানাইলাল চন্দননগর থেকে বোম্বাই যান। সেখানে পড়াশোনা করতে করতে তিনি একবার চন্দননগরে আসেন। তখন তাঁর বয়স নয় কি দশ বৎসর।

চন্দননগরে এসে স্থানীয় ডুপ্লে কলেজে তিনি এক বৎসর পড়েন। তারপর আবার তিনি বোম্বাই ফিরে যান এবং ১৯০৩ সাল পর্যন্ত সেখানে পড়াশোনা করেন।

শৈশব থেকেই কানাইলালের চরিত্র কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য সকলের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। শুধু ভাল ছাত্র হিসাবে নয়, ভাল ছেলে হিসাবেই তিনি অধিকতর প্রিয় হয়ে উঠেছিলো। দরিদ্র সহপাঠীদের প্রতি ভালবাসা, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করার আন্তরিক আগ্রহ বরাবরই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে এবং অতি সহজেই তিনি দরিদ্রদের আপন করে নিতে পারতেন। শুধু ছাত্র বয়সে নয়, পরবর্তী জীবনেও এটা তাঁর বজায় ছিল। দরিদ্রদের প্রতি সহজাত আকর্ষণের ফলেই বোধ হয় সকলপ্রকার বিলাসের প্রতি ঔদাসীন্য তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ছেলেবেলা থেকেই বেশ দেখা গেছে, পোষাক পরিচ্ছদ, কিংবা আহারাদি ব্যাপারে তাঁর অবারিত প্রাচুর্য থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ছিল অনাগ্রহ। সকল ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অল্পে তুষ্ট—আশুতোষ, সর্বতোষ। কানাইয়ের অতি প্রিয় খাদ্য ছিল মুড়ি আর দুধ। শোনা যায় কিশোর কানাই দৈনিক আড়াই সের পর্যন্ত মহিষের দুধ খেতে পারতেন। চিরবিদায়ের দিনে মায়ের কাছ থেকে মুড়ি আর দুধ চেয়ে খেয়েছিলেয় তিনি। নিজে খাওয়া-দাওয়ার প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল না থাকলেও দরিদ্রকে খাওয়াতে তাঁর বিশেষ যত্ন ছিল। বোম্বাই স্কুলে দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয় ছেলেদের প্রায়ই

ভোজনের ব্যবস্থা করে দিতেন তাঁর মাকে বলে। এদের মধ্যে একজন ছেলে তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। তার নাম 'টোষা'। কানাইলাল তাঁর সম্বন্ধে ঐ নামেরই উল্লেখ করতেন। শোনা যায় এই ছেলেটির বাবা-মা প্লেগে মারা যায়। কানাইলালই এই আশ্রয়হীন অনাথকে আশ্রয় দেন। ভবিষ্যতে নিজ দেশে পরবাসী কোটি কোটি অনাথ ভারতবাসীর স্বাধীন আশ্রয়ের জন্য তিনি জীবন দিয়ে সাধনা করে গেলেন!

কানাইলালের চরিত্রের যেটি সব চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য দিক সেটি হল তাঁর অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা। ভারতে আমরা দেখেছি রাজনৈতিক নেতাদের জীবনে নৈতিকতার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। প্রায় সকলেই, সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, সংযম প্রভৃতির ওপর জোর দিয়েছেন, আত্মসংগঠনের কথা প্রচার করেছেন। সৈনিক কানাইলালের জীবনেও সেই উচ্চভাব, সেই আদর্শ কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। কানাইলাল কাজের মানুষ। তাই জীবনের প্রথম স্তর থেকেই তিনি নিজেকে নিষ্ঠার সঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন। এমন শোনা যায়, তিনি জীবনে নাকি কোনদিন মিথ্যাকথা বলেন নি। কথাটা সত্যিই শুনে ভাববার মত। কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক্। একদিন দুপরে কানাইলালের মামা, কানাইলালকে রোদ্দুরে বার হতে নিষেধ করে দেন। গুরুজনের আজ্ঞাবাহী কানাই তিনতলায় চিলের ছাদের ছায়ায় বসে অন্য ছেলেদের ঘুড়ি ওড়ানো দেখছিলেন। মামা ভাবলেন কানাই

বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ

নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

নিশ্চয়ই রোদ্দুরের মধ্যে অন্য ছেলেদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। তিনি একতলা থেকে কানাইকে ডেকে পাঠালেন। কানাই নেমে আসতেই মামা তাঁর পিঠে এক চড় বসিয়ে দিলেন। কানাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। এর ফলে মামা আরও রেগে গিয়ে আরও দু-চার ঘা চড় বসিয়ে দিলেন কানাইয়ের পিঠে। কানাই কোনরকম প্রতিবাদ করলেন না কোন কথা বললেন না। কিন্তু তাঁর মনে মনে এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিমান ঘনিয়ে উঠছিল। কানাই-লাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সে কান্না কিছুতেই থামে না। কারও কথায় সে কান্না থামল না। অনেকক্ষণ সাধাসাধির পর কানাই বললেন যে তিনি রোদ্দুরে যান নি, এবং তাঁর কথা কেন যে বিশ্বাস করা হচ্ছে না, সেই জন্যেই তাঁর দুঃখের শেষ নেই। তিনি আরও বললেন, তাঁর কথায় বিশ্বাস না করলে তিনি জলগ্রহণ করবেন না। বালক কানাইলালের মধ্যে সত্যাগ্রহীর জ্বলন্ত রূপ ফুটে উঠল। অগত্যা কানাইয়ের মামা ছাদের অন্যান্য ছেলেদের ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে কানাই যা বলছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মামা ব্যথিত হয়ে কানাইয়ের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করলেন। কানাই পরম আনন্দে খেতে বসলেন। এই সামান্য ঘটনা তাঁর আত্মীয় স্বজনের কাছে তাঁর সত্যনিষ্ঠার স্বাক্ষর হয়ে রইল। ভবিষ্যতে এ কথাটা সকলেই জেনে নিয়েছিল যে কানাইলাল কখনও মিথ্যা কথা বলে কাউকে ঠকাবেন না। এই তুচ্ছ

ঘটনার পাশাপাশি, অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের এক বিশিষ্ট ঘটনার কথা স্মরণ করি। কানাইলাল যখন বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে চন্দননগর থেকে কোলকাতায় আসা ঠিক করলেন তখন চিন্তিত হয়ে তাঁর মা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি কোথায় যাচ্ছেন? কানাইলাল বলেছিলেন তিনি চাকরী করতে যাচ্ছেন! হ্যাঁ, চাকরী করতে যাচ্ছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে চাকরী বড় ভয়ানক! সৈনিক কানাইলালকে যুদ্ধের ধর্ম বজায় রাখতে হয়েছিল। যুদ্ধজয় করতে হলে চাই ছল, বল, কৌশল। যুধিষ্ঠিরকে বলতে হয়েছিল অশ্বত্থামা হত। তারপর হয়ত তিনি অতি ক্ষীণস্বরে বলতে চেয়েছিলেন ইতি গজ। কানাইয়ের মা ব্রজেশ্বরী দেবী অকুণ্ঠচিত্তে বিদায় দিতে পেরেছিলেন ছেলেকে। এবং যখন রাজদ্রোহের অপরাধে কানাইলাল গ্রেপ্তার হয়েছেন বলে খবর বার হল, তখন পর্যন্ত ব্রজেশ্বরী দেবী বিশ্বাস করতে পারেন নি যে কানাই প্রকৃতই এর সঙ্গে লিপ্ত আছেন। সত্যকাম কানাইলাল ধরা পড়বার পর, যখন শোনা যাচ্ছিল তাঁর দ্বীপান্তর হবে, তখন তিনি বলেছিলেন যে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে না। তাঁর কথা কি ভাবে সফল হল পরবর্তী অধ্যায়ে তার পরিচয় মিলবে।

১৯০৩ সালে প্রবেশিকা পাশ করে কানাইলাল চন্দননগর এসে স্থানীয় ডুপ্লে কলেজে ভর্তি হলেন। তখন ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে স্বদেশী কর্মীদের একটি কেন্দ্র ছিল। সেখানে বিভিন্ন কর্মীরা এসে মিলিত হতেন,

পৃথিবীর ইতিহাস, রাজনীতি, বিপ্লব আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। তাছাড়া সেখানে একটি ব্যায়াম কেন্দ্র ছিল। এই ব্যায়াম কেন্দ্রে শরীর চর্চা ছাড়া লাঠি-ছোরা খেলা, শিকার করা, বন্দুক ছোঁড়া প্রভৃতি শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। এই সকল বিষয়েই উদ্যোগী ছিলেন চারুবাবু নিজে। এঁরই আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় বহু যুবক উদ্বুদ্ধ হতেন। কানাই-লালও চারুবাবুর কাছে প্রথম স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি আলোচনার মধ্যে কানাইয়ের প্রিয় ছিল রুশিয়ার নিহিলিষ্ট আন্দোলন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবের ইতিহাস। ব্যায়াম চর্চার মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধে কানাই সবচেয়ে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। মুষ্টিযুদ্ধে তাঁর কিরূপ দখল ছিল তার পরিচয় নিম্নের ঘটনায় পাওয়া যাবে।

কানাইলাল যে ঘরে শুতেন সে ঘরের দক্ষিণ দিকে একটা গণিকা পল্লী ছিল। সেখানে প্রতি-রাত্রে হাঙ্গামা হত। আশপাশের ভদ্রলোকদের নিয়ত অশান্তি ও অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল ঐ পল্লীটি। গঙ্গার ধারে যেসব চটকল ছিল তার উচ্চপদস্থ কয়েকজন সাহেব কর্মচারীরও নিত্য আগমন ছিল ঐ পল্লীতে। তারা অনেক রাত পর্যন্ত মদ খেয়ে রাস্তায় অশ্লীল আচরণ ও হল্লা করে বেড়াত। সাহেবকে ভয় করাই তখন রীতি। প্রতিবাদ করবার সাহস কারও ছিল না। কিন্তু দিন দিন কানাইলালের কাছে ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। একদিন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। সেদিন রাতে

রোজের মত সাহেবরা মদ খেয়ে রাস্তায় হৈ-চৈ সুরু করে দিয়েছে মারধোর করতে আরম্ভ করে দিয়েছে আশপাশের লোককে। কানাইলাল বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। সাহেবদের দলে ছিল তিনজন। কানাইলাল প্রথমে ভাল কথায় নিষেধ করলেন; কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। মাত্রা বেড়ে চলল। আর এক মাত্রা চড়িয়ে দিলেন কানাইলাল। প্রথম সাহেবের নাকের ওপর এমন এক ঘুঁষ মারলেন যে সাহেব তিন পাক ঘুরে নর্দমার ওপর গিয়ে পড়ল। ব্যাপার দেখে আর দুজন ছুটে পালাচ্ছিল, কানাইলাল তাড়া করে গিয়ে আর একজনের রগের ওপর এক ঘুঁষি মারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে ধরাশায়ী হল। বাকী জন কোন গতিকে প্রাণ নিয়ে পালাল। এর পর থেকে ঐ পল্লীতে সাহেবদের আর শুভাগমন বা নৈশ অভিসার হয় নি। তখনকার দিনে সাহেব কর্মচারীদের ওপর এরূপ ব্যবহার করতে গেলে কতখানি সাহস ও শক্তির প্রয়োজন হত আজকের দিনে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

অনুরূপ আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। ১৯০৭ সালে চন্দননগর Warren's circus নামে এক সাহেব কোম্পানী সার্কাস দেখাতে আসে। স্বদেশী যুগের ভরা জোয়ার তখন, বিপ্লবের আগুনে সারা দেশ তপ্ত। সাহেব কোম্পানী সার্কাস দেখিয়ে পয়সা লুটে নিয়ে যাবে এটা আর সহ্য করা যায় না। তাছাড়া আবার ভেতরে বসবার জায়গায় সাদা ও কালা আদমীর মধ্যে বিরাট প্রভেদ। এই ভেদাত্মক নীতিই

যেন আরও আগুন জ্বালিয়ে দিল। ঠিক হল সার্কাস বয়কট করা হবে। কথামত কাজ। কানাইলাল কয়েকজন সমবয়সী তরুণকে সঙ্গে নিয়ে সার্কাসের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলেন এবং টিকিট বিক্রী বন্ধ করবার উপক্রম করে তুললেন। সার্কাসের সাহেব ম্যানেজার বাইরে এসে কানাইলালকে গালাগাল দিতে লাগল। কানাইলালও নীরব রইলেন না, সমানে উত্তর দিয়ে গেলেন। সাহেব রাগ সামলাতে না পেরে লাঠি দিয়ে মারতে গেল কানাইলালকে। মুষ্টিযোদ্ধা কানাইলাল লাঠি এড়িয়ে বাঁ হাতের এক ঘুঁষিতে সাহেবকে ধরাশায়ী করে দিলে। দশহাত দূরে তাঁবু খাটাবার খোঁটা পোঁতবার এক গর্তে পড়ে সাহেব রক্ত বমন করতে লাগল। সাহেব যদি মরে যায় তা হলে ব্যাপার সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াবে একথা উপলব্ধি করে কানাইলাল দলবল নিয়ে অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করলেন। যথারীতি পুলিস এল, সাহেবকে হাঁসপাতালে পাঠাল এবং আঘাতকারীর সন্ধান করতে লাগল। তবে, সার্কাস কোম্পানী পরদিনই চন্দননগর ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করল। কানাইলাল সেদিন তরুণ সমাজের মুখোজ্জ্বল করে তাদের মধ্যে অগ্রণী হয়ে দাঁড়ালেন।

এসব ঘটনা শুনে যদি কেউ মনে করে যে কানাইলালের কাজ ছিল শুধু গুণ্ডামী তাহলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। সংগঠনের কাজে কানাইলালের অবদান যে কতখানি সে বিষয়েও কিছু জানা দরকার। ১৯০৫ সালে বার্ণ কোম্পানীর দেশীয়

কর্মচারীরা ধর্মঘট করে। এখনকার ধর্মঘটের হিড়িকের দিনে হয়ত হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না এই ধর্মঘটের গুরুত্ব কতখানি। সেই প্রথম, অত্যাচারিত, হতচেতন, দেশবাসী বিদেশী বণিক শাসকের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিল মিলিত প্রতিবাদ। যে বিদেশী শাসক তাদের সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ পাকা করে রাখবার জন্যে, গোলামী কররার জন্যে, ইংরাজী শিক্ষা দিয়ে সৃষ্টি করে-ছিল কেরাণীর দল, সেই কেরাণীরাই ধর্মঘট ঘোষণা করে প্রথম প্রত্যুত্তর দিয়েছিল সেই কারসাজির! কিন্তু এত লোকের অন্ন সংস্থান করা বড় সোজা কথা নয়। তাদের প্রত্যেকের সংসার আছে, পোষ্য আছে বহু। কাজেই সহৃদয় দেশবাসী তাদের সাহায্যের জন্য এক ভাণ্ডার স্থাপন করে। কানাইলাল চারুবাবুর নেতৃত্বে চন্দননগরে এক সাহায্য ভাণ্ডার খুলে সেখানে টাকা তোলবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। আবার বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধকল্পে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা যখন রাখীবন্ধনের প্রস্তাব ঘোষণা করলেন, তখন চন্দন-নগরে এই উৎসব সমাধা করবার জন্যে পুরোভাগে দেখা গেল কানাইলালকে। ১৯০৭ সালে মাঘ মাসে এক অর্ধোদয় যোগ হয়। স্নানার্থীদের সাহায্যের জন্য সর্বত্র সেবক দল সংগঠিত হয়। এই সেবক সঙ্ঘ দল সংগঠনের প্রেরণা পাওয়া গিয়েছিল কানাইলালের কাছ থেকে। কানাইলালই পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে ত্রিবেণী স্নানঘাটে স্নানার্থীদের সুখ-সুবিধার জন্য এক সেবক-সঙ্ঘ সংগঠিত করেন। অর্ধোদয় যোগের

সময় চন্দননগরেও সেবক সঙ্ঘ সংগঠিত হল কিন্তু দুঃখের বিষয় সেবার কানাইলাল ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কাজ করতে পারলেন না। এই ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল তাঁর জয়যাত্রা পথের কণ্টক স্বরূপ। প্রায়ই তিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন, তবে, জ্বরাক্রান্ত হলেও সাধ্যমত তিনি কাজ করতে চেষ্টা করতেন। দেখা গেছে তিনি জ্বরদেহেই একখানা চাদর গায়ে এবং এক-জোড়া ছেঁড়া মোজা পায়ে দিয়ে ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন। একবার কিন্তু তিনি সকলকে স্তম্ভিত করে দিলেন। তখন তাঁর জ্বর চলছে—১০৫° পর্যন্ত তাপ উঠছে। এই সময়ে চন্দননগরে ভীষণ এক অগ্নিকাণ্ড হয়। আগুন দেখে সকলে ছুটে এসে দেখে যে কানাইলাল সবার আগে সেই জ্বরদেহেই এসে হাজির হয়েছেন এবং ঘর্মাক্ত কলেবরে চালের ওপর উঠে অক্লান্ত ভাবে জল ঢেলে চলেছেন। একাদিক্রমে পাঁচ ছয় ঘণ্টা আগুনের সাথে লড়াই করে আগুন যখন অনেকটা নিভে এল তখন ক্লান্তদেহে কানাইলাল বসে পড়লেন। তারপর তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু, সহকর্মী ও প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় ও অন্যান্য বন্ধুর কাঁধে ভর দিয়ে কোনগতিকে বাড়ী ফিরে গেলেন। দেশের ও দশের সেবা তাঁর হৃদয় এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে তার জন্য তিনি সব কিছুই ভুলে যেতে পারতেন। তার জন্য তাঁর কাছে কোন ত্যাগই যথেষ্ট ছিল না।

এত কাজ করেও তাঁর ক্লান্তি ছিল না। তিনি যে ছাত্র, পড়াশোনা তাঁর যে অন্যতম প্রধান কর্তব্য সেদিকে তাঁর দৃষ্টি

এতটুকু অসতর্ক ছিল না। আগেই বলেছি তিনি পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় হতেন। শুধু পরীক্ষার পড়া নয়—সত্যিকারের পড়াশোনা করতেন তিনি। ভারতের ইতিহাস অতি নিখুঁত-ভাবে তাঁর জানা ছিল। পৃথিবীর রাজনীতির ধারার সঙ্গে ছিল অন্তরের যোগাযোগ। বিপিনচন্দ্রের তখনকার কাগজ New India পড়তে কানাইলাল খুব ভালবাসতেন। তাছাড়া Bondemataram সন্ধ্যা, যুগান্তর প্রভৃতি সব কাগজই তিনি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। সারা দিন কাটতো পড়াশোনা আর আলোচনা নিয়ে। মাঝে মাঝে তর্ক বিতর্ক নিয়ে রাত্তির কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি। সাধারণতঃ কিন্তু রাত্তিরে তিনি চিন্তা করতেন। সে যে কোন্ সোণালী দিনের স্বপ্ন তিনি ধ্যান করতেন তা জানা নেই। তবে মাঝে মাঝে তাঁকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখা যেত। মাথায় আবার জল ঢালতে হত। রাত্তিরে প্রায়ই ঘুম ছিল না, এমনি ভাবেই রাত কাটতো। এর থেকেই তাঁর মনের একাগ্রতা, ও আগ্রহশীলতার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। দেশের ও দশের প্রতি তাঁর কী পরিমাণ দরদ ছিল তার আভাষ কিছু মেলে তাঁর এই সকল কার্যকলাপ থেকে।

বিপ্লবের আহ্বান

পরোপকারী, সত্যাশ্রয়ী, ও মেধাবী কানাইলাল প্রথম জীবনে এইটুকু বুঝেছিলেন যে দেশের ও দশের সেবা করতে হবে। এই সেবার মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা একেবারে ছিল না বলা যায় না, তবে গুপ্ত-সমিতির গঠনের চিন্তা বোধ হয় ছিল না। স্বাধীনতা বলতে বিদেশী দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী জিনিষের প্রতি লোকের আগ্রহ বাড়ানো, আর্তের সেবা করা, সভা-সমিতি করা, প্রয়োজন হলে ধর্মঘট ও সাহায্য ভাণ্ডার খোলা—এইভাবে লোকের মনে স্বাদেশিকতা জাগিয়ে তোলাই ছিল কানাইলালের মত তরুণদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই অবস্থায় কানাইলাল কেন যে গুপ্ত-সমিতিতে বারীন্দ্রের বোমার কারখানায় এসে যোগ দিলেন, সেটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

আগেই বলা হয়েছে বাংলার অগ্নিযুগের উদ্যোক্তা অরবিন্দ ও বারীন্দ্র। অরবিন্দ থাকেন সবার পশ্চাতে, অনেকটা অন্তরালে আর বারীন্দ্র তরুণদের প্রত্যক্ষ নেতা। এক কথায় বারীন্দ্রের নেতৃত্বেই বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। দেখা যায় বাংলার প্রতি জেলায় প্রায় দশ বারো জন যুবক প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। এই ঢেউয়ের দোলা এসে পৌঁছয় চন্দননগরেও। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

মশাই তখন চন্দন-নগরে শিক্ষকতা করছেন। তিনি ছাত্রদের বেত মেরে এই শিক্ষা দিতেন যে এই দেশটা ইংরেজের নয়—কারণ, ইংরেজের ক্ষমতা নেই তাঁর বেত মারা বন্ধ করে। এই উপেন্দ্রনাথ যখন বারীন্দ্রেব কর্মকেন্দ্রের সংবাদ পেলেন, এবং আরও জানলেন যে বাংলার সকল জেলাতেই এই কেন্দ্রের স্পন্দন শাখায়িত হয়ে উঠেছে, তখন তিনি চন্দননগর ছেড়ে কোলকাতায় গিয়ে হাজির হলেন এবং বারীন্দ্রের" সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

বারীন্দ্রের সমিতি গুপ্ত-সমিতি। কাজেই প্রকাশ্য ভাবে তার কোন প্রচার ব্যবস্থা ছিল না। তবু, কয়েকটা ঘটনা এমনই ঘটে যার ফলে সাধারণ লোকে ধারণা করে নেয় যে এরকম একটা গুপ্ত-সমিতির প্রয়োজন আছে, বা ইতি পূর্বেই গঠিত হয়েছে। লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের চেষ্টা এবং ছোটলাট ফুলারের অত্যাচার কাহিনী লোককে স্বাদেশীকতায় উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছিল। আগেই বলেছি তখনকার জাতীয়তাবাদ ধর্ম-নিরেপক্ষ নয়। অরবিন্দ—ভবানী মন্দিরের উপাসক অরবিন্দ—এক হাতে তরবারী আর অন্য হাতে গীতা নিয়ে সংগ্রামে নেমেছেন। বলাবাহুল্য, এই সকল বিপ্লবীদের মধ্যে সকলেই ছিলেন হিন্দু। এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লার হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার—ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি জায়গায় হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচার, জামালপুরে মুসলমান জনতা কর্তৃক হিন্দুদের বাসন্তী প্রতিমা ভঙ্গ ও নারী ধর্ষণ

বিপ্লবী (হিন্দু) যুবকদের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করে তোলে। প্রতিশোধের ইচ্ছায় পাগল হয়ে ওঠে এরা। এবং সেই প্রতিশোধের পাত্র যে প্রথমে ইংরেজ সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে তাদের ভুল হয় না। সর্বাপেক্ষা বেশি উত্তেজনার সৃষ্টি করে বরিশালে প্রাদেশিক কনাফরেন্স ছত্রভঙ্গ করে দেবার চেষ্টা। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের শাসনকাল চলছে তখন। অত্যাচারের সীমা নেই, রিজলী সার্কুলার প্রচলিত হয়েছে। ইমার্সন সাহেবের সভা ভঙ্গ করার নিষেধ অমান্য করায় দেশের নেতাদের ওপর পুলিস বেপরোয়া লাঠি চার্জ করে। সুরেন্দ্রনাথের মত নেতাকে অপমানিত করা হয়। সুরেন্দ্রনাথকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। সেদিন দেশের সর্বত্র আগুন জ্বলে ওঠে। চন্দননগরেও ফরাসী সরকারের সঙ্গে স্থানীয় লোকেদের বিরোধ সুরু হয়ে যায়। এবং ইংরেজ রাজত্বের চেয়েও এখানকার উৎপীড়ন আরও ভীষণ আকারে দেখা যায়। শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা কালা আদমিদের ঘৃণার চক্ষে দেখতে আরম্ভ করে দেন। বন্দেমাতরম ধ্বনি ফরাসী রাজশক্তির কানেও অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে চন্দননগরে একটা ঘটনা ঘটে। স্থানীয় এক হোটেলের শ্বেতাঙ্গ মালিক তার পাশের বাড়ীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোন মহিলার প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত করায় তাকে উত্তম-মধ্যম প্রহার করা হয়। এই ব্যাপার অসাধারণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ফরাসী পুলিস ঐ বাড়ীতে ঢুকে ঐ বাড়ীর কর্তাকে

গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় যুবকগণ প্রতিশোধের জন্য অধীর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে পূর্ব-বর্ণিত মতিলাল রায়ের দল যেন মরীয়া হয়ে ওঠে, প্রতিকার যে ভাবে হোক করতেই হবে। মতিলাল রায় জানতেন যে কানাইলালের কাছেই প্রকৃত সাহায্য পাওয়া যাবে। এবং এই ঘটনা হতেই কানাইলালের স্বরূপ জানা যাবে। মতিলাল রায় তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে, কানাইলালের কাছে একখানা উড়ো চিঠি লিখলেন এই মর্মে—যদি তুমি সত্য দেশসাধক হও, দেশহিতে জীবন বলি দেবার স্পর্ধা রাখ, তাহা হইলে আগামী অমাবস্যার দ্বিপ্রহর নিশীথে শ্মশানের বটবৃক্ষমূলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।

নির্দিষ্ট রাতে মতিলাল রায় তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বটগাছের নীচে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দুই প্রহরের সময় কানাইলালের আসবার কথা। কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল তবুও কারও দেখা নেই। নিস্তব্ধ শ্মশানে শুধু ঝিঁ ঝিঁ ডাক শোনা যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি চলে না—শুধু নিরন্ধ্র অন্ধকার। মতিলাল মনে করলেন কানাইলাল বৃথাই ব্যায়াম চর্চা করে, উচ্চ আদর্শের কথা বলে, মনে মনে সে এখনও যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করতে পারে নি। ফিরে যাবেন ভাবছেন এমন সময় দেখা গেল সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে ঢেকে কে যেন তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। চিনতে দেরী হল না—কানাইলাল! কানাইলাল যে চিঠি পেয়েছিলেন তাতে মতিলালের নাম ছিল না, কারও নাম ছিল না, কাজেই কানাইলালকে এত সাবধানে আসতে

হয়েছিল। কিন্তু মতিলালকে দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, 'বুঝেছি, তুমি ছাড়া আর এ কাজ কে করবে? তারপর খবর কি?' অতি সহজ, অতি প্রসন্ন, অতি উজ্জ্বল কানাইলালের মুখ। মতিলাল আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেলেন। কানাইলালের দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠে কি অব্যক্ত প্রতিজ্ঞা যেন জ্বল জ্বল করছে। মতিলাল যেন সম্ভ্রমে মাথা হেঁট করলেন। হঠাৎ এক দমকা বাতাসে কানাইলালের কালো চাদরখানা সরে গেল। দেখা গেল কোমরে একখানা খুব বড় ছুরি ঝকঝক করছে। কিছুক্ষণের জন্য মতিলাল অভিভূত হয়ে রইলেন—বাঙ্গালীর এক অপূর্বরূপ দেখছেন তিনি! যে বাঙ্গালী ভীরু বলে সর্বত্র বিদিত। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের আলোচনা হল। কানাইলাল ভবিষ্যৎ কর্মপথ সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন। তারপর তাঁরা দুদিকে চলে গেলেন। কানাইলাল একদিকে এবং মতিলাল ও তাঁর বন্ধু একদিকে। পথে খস্ খস্ আওয়াজ পেয়ে মতিলাল একবার পিছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন অদূরে ভাঙ্গা মন্দির থেকে আরও দুজন বেরিয়ে এসে কানাইলালের সঙ্গে মিলিত হল। আশার বিদ্যুৎ চমকে উঠল মতিলালের বুক জুড়ে। কানাইলাল সত্যি সত্যিই নাম লিখিয়েছে!

জামালপুরে মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করবার পর ঠিক হয় একদল বিপ্লবী ছেলে বোমা নিয়ে সেখানে যাবে এবং বোমা মেরে মুসলমানদের পাড়া উড়িয়ে দেবে। আগেই

বলেছি যে তখনকার যুগে জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম একত্র জড়ানো ছিল (এখনও কি তাই হয়ে পড়ছে ?)। তাছাড়া বিপ্লবীরা নিজেদের এতই ন্যায়বান মনে করতো, যে তাদের ধারণা হত যারা অত্যাচারী তারা যেই হোক তাদের শাস্তি বিধান করতে হবে। যাই হোক, কানাইলাল মনস্থ করেন এই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। কিন্তু এই দল জামালপুরে পৌঁছবার আগেই পুলিসের হাতে সন্দেহজনক ভাবে ধরা পড়ে যায়।" কাজেই, কানাইলালের ইচ্ছা আর পূর্ণ হয় না।

ঠিকমত বারীন্দ্রের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যোগ দেন তিনি বি, এ, পরীক্ষা দেবার পর। কিন্তু তার আগেই চন্দননগরে বসে তাঁর কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই কানাইলালের সংগঠনের ক্ষমতা অসীম। এবং অতি সহজেই তিনি লোকের প্রিয় হয়ে উঠতেন। কাজেই তাঁর পক্ষে ছোট ছোট দল বা আখড়া গড়ে তোলা বিশেষ কষ্টকর ব্যাপার নয়। শোনা যায় বারীন্দ্রের কার্যকলাপের প্রথম যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় একটা সমিতি গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল ইংরেজ রাজত্বের বাইরে যদি একটা আস্তানা করা যায় তাহলে কাজের সুবিধা হবে, তাই তিনি চন্দননগরে সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করেন। বারীন্দ্রের সমিতি বোমা তৈরী করার কারখানা আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সমিতি—'সারস্বত আয়তন' জাতীয় ভাবধারায় আদর্শ যুবক গঠনের কেন্দ্র। ব্রহ্মবান্ধবের সমিতি লোকের মন আকর্ষণ করে নি, বারীন্দ্রের

সমিতিতে মন টেনেছিল। ব্রহ্মবান্ধব মানুষটি ছিলেন অতি বিচিত্র। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিন্ধু প্রদেশে যান। সেখানে নিজেই আবার ধর্ম পরিবর্তন করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং খৃষ্টধর্ম থেকে আবার পরবর্তী জীবনে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হয়ে পড়েন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'সন্ধ্যা' যুবক মহলে সন্ত্রাসবাদের ইন্ধন জোগাতো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সারস্বত আয়তন স্থাপনায় যুবকদের সমর্থন পাওয়া যায় নি। আসলে চন্দননগরে প্রথম বিপ্লবী দলের পত্তন হয় অধ্যাপক চারু রায়ের নেতৃত্বে ব্যায়াম চর্চা কেন্দ্রে এবং পরবর্তী কালে কানাইলাল একা চন্দননগরেই ছয় সাতটি সমিতির শাখা স্থাপন করেন। এই বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেন শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছাত্র বন্ধু মতিলাল রায় প্রমুখগণ। তবে একথাটাও মনে রাখতে হবে যে কানাইলাল যে সমস্ত শাখা স্থাপন করেন তার অন্তরে যাই থাক, বাইরে থেকে লোকে জানতো এগুলি ব্যায়াম চর্চার কেন্দ্র কিংবা আলোচনার কেন্দ্র ছাড়া কিছু নয়। মূল কেন্দ্র ছিল কানাইলালের বাড়ীতে। সেখানে খুব লাঠি খেলা হত। মার্তাজা নামে একজন লাঠিয়াল লাঠি খেলা শেখাতো। কানাইলাল মার্তাজার কাছে খুব পাকা লাঠি খেলা শিখে-ছিলেন। কানাইলালের দেখাদেখি বহু যুবক লাঠি খেলায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। অবশ্য তখনকার যুগে ভদ্রলোকের ছেলে

লাঠি খেলছে দেখে লোকে বিরুদ্ধ সমালোচনা যে করতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কানাইলালের আগ্রহে ও উৎসাহে এ সব সমালোচনা দাঁড়াতে পারে নি। শুধু তাই নয়, এই সকল সমিতিতে কোনরূপ শ্রেণীবিচার ছিল না। সকলেরই ছিল সমান অধিকার। আগেই বলেছি, বিপ্লব-যজ্ঞের প্রধান হোতা অরবিন্দ প্রথম প্রোলেটেরিয়টদের স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হবার কথা বলেন। বিপ্লব-যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত কানাই-লালের লক্ষ্যও সেদিকে ছিল। কানাইলালের যুবক সমিতি গঠনের আসল উদ্দেশ্য যে কি তা মাঝে মাঝে যে প্রকাশ হয়ে না পড়তো এমন কথা বলা যায় না। তবে সমিতির রবি-বাসরীয় অধিবেশনে দু'একজন রাজকর্মচারীকেও যোগ দিতে দেখা যেত। এই সব রবিবাসরীয় অধিবেশনে, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি সাংস্কৃতিক আলোচনা হত, কাজেই, বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ঐ সমিতির উদ্দেশ্য শুধু মারামারি-গুণ্ডামী করাই ছিল না, জাতিগঠনও তার একটা প্রধান অঙ্গ বলে পরিগণিত হত। কেবলমাত্র ঘরে বসে বই পড়ে বা আলোচনা করেই দেশের স্বরূপ জানা যায় না! দেশকে জানতে হলে নিজের চোখে পরিদর্শন করা, বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করার প্রয়োজন। এই জন্যই সমিতির সভ্যেরা স্থির করেন বাংলা-দেশ ভ্রমণ করবেন। প্রথমে বাংলাদেশ তারপর বাংলার বাইরের দেশ। কানাইলাল সভ্যদের মাঝে অগ্রণী হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন বাংলাদেশ ঘুরবেন বলে। কোলকাতার

নরেন্দ্রনাথের হত্যাকারী কানাইলাল—আদালতের পথে

আলিপুর কোর্টে বিচারাধীন আসামী কানাইলাল ও সত্যেন্দ্র

সমিতি-কেন্দ্র কিন্তু কথাটা তেমন আগ্রহের সঙ্গে কেউ গ্রহণ করে নি। যাই হোক, প্রায় মাইল ষাটেক ভ্রমণ করবার পর এক পরিচিত পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কানাইলালের সঙ্গে কয়েকজন বন্ধুও ছিলেন। পুলিশ কর্মচারীটি তাঁদের সদুপদেশ দিয়ে বলেন যে এরকম ঘুরে বেড়ালে পুলিশের সন্দেহ হতে পারে এবং অনর্থক গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কানাইলাল বুঝে দেখলেন, ভবিষ্যতে তাঁর বিরাট কর্মক্ষেত্র পড়ে রয়েছে সুতরাং এখন থেকে পুলিশের হাতে পড়ে কোন লাভ নেই। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ভ্রমণের সঙ্কল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

বিপ্লবী-সমিতি গঠন করার পূর্বে কানাইলাল ও তাঁর সহযোগিদের একটী মিলনকেন্দ্র ছিল। এখনকার যুগে যেমন প্রতি পাড়ায় ক্লাব, বৈঠক দেখা যায় তখনকার যুগে তা ছিল না। বিশেষ চন্দননগরের মত ছোট জায়গায়। কানাইলালের দল সেই অবস্থায় একটি বৈঠক গড়ে তোলে। সেখানে বড় ধরণের আলোচনা হত না, হালকা আমোদ-উৎসবের আয়োজন ছিল। ধীরে ধীরে এই বৈঠকেরই বহু রূপান্তর ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত সভ্যেরা এক একটি বিপ্লবী হয়ে ওঠেন। শোনা যায় এই বৈঠকে কানাইলাল একজন সামান্য সভ্য ছিলেন মাত্র। তবে প্রতি সন্ধ্যায় তিনি আসতেন এবং ঐ বৈঠক-পরিচালিত যে নাট্যসমাজ ছিল সেখানে বসে বসে কোনদিন এসরাজ বাজাতেন কোনদিন বা হার্মোনিয়াম নিয়ে গান গাইতেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসরাজ বাজাতে তিনি জানতেন না, কেবল

কোনমতে ছবি টেনে পর্দা টিপে আমোদ উপভোগ করতেন। গানের অবস্থাও একরূপ। এক পর্দায় বাজনা বাজতো আর বিকৃত সুরে আর এক পর্দায় চিৎকার করে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আপন মনে তিনি গান গাইতেন। সকলের কাছেই এ দৃশ্য বেশ উপভোগ্য বোধ হত। তবে গান-বাজনায় প্রচুর উৎসাহ থাকলেও অভিনয়ের দিকে তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা যেত না। রিহার্স্যালের সময় হয়ত তিনি আপন মনে গান গেয়ে চলেছেন দেখে জোর করে থামাতে হত। একবার থামিয়ে দিলে তিনি চুপ করে অভিনয় দেখতেন আর মাঝে মাঝে হাসির দৃশ্য থাকলে হো-হো করে বিকট শব্দে হেসে উঠতেন। বরাবরই তাঁর হাসির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে, তিনি যে একেবারেই অভিনয় করতেন না, এমন কথা বলা যায় না। মাঝে মাঝে তাঁকে ছোট পার্ট, যেমন দূতের পার্ট দেওয়া হত। তিনি রঙ্গীন সাজ পরে মঞ্চে উঠে দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে কোন গতিকে দু'একটা কথা বলতেন কি বলতেন না। এই পর্যন্ত ছিল তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য। কিন্তু পরবর্তী জীবনে, কারাগারে, পুলিশের জেরার সামনে তিনি কি সুচতুর অভিনয় করে গেছেন!

অল্প কিছুদিন পর এই অভিনয়ের আসর ভেঙ্গে গেল। তখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবে দেশ প্লাবিত। দরিদ্র-নারায়ণ সেবার আদর্শে বহু যুবক অনুপ্রাণিত হচ্ছে। এরাও মিলনকেন্দ্র নাট্যসমাজ সব ভেঙ্গে ফেলে কয়েকজনে মিলে

'সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়' নামে এক সমিতি গড়ে তুললে। কানাইলাল কিন্তু এই দলে যোগদান করেন নি। এই দলের উদ্দেশ্য পরোপকার করা ত বটেই তার সঙ্গে আবার হরিসংকীর্তন করা ইত্যাদি ধর্মকর্মের একটা দিকও ছিল। সত্যকাম কানাই-লালের কিন্তু ঐ সব ধর্মকর্মের দিকে বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। তা ছাড়া এই সময় তাঁর পড়াশোনার ওপরও চাপ পড়েছিল একটু বেশি। এই সময়ে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর এফ, এ, পড়বার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। অবশ্য সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়ের আয়ু বেশী দিন ছিল না। স্বাদেশি-কতার বন্যায় সব ভেসে গিয়ে একাকার হয়ে গেল। তখন বঙ্গভঙ্গ রোধের যুগ। ১৯০৫ সালের আন্দোলনের প্রথম প্রভাত। ৭ই আগষ্ট সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতাদের নেতৃত্বাধীনে কোলকাতার রাজপথে মিছিল বার হয়েছে। মিছিলে অসংখ্য যুবক চলেছে—মাথায় তাদের হলদে রঙের উষ্ণীষ। সেদিন বাঙ্গালী জয়গর্বে ঘোষণা করেছে ইংরাজের দেওয়া বঙ্গ-বিভাগ মানবো না, বণিক শোষণ চলবে না, বিদেশী দ্রব্য বর্জন কর। …সারা ভারত জুড়ে এই আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে লেগেছে। সারা দেশ প্লাবিত, মথিত হয়ে উঠেছে। কোলকাতা থেকে মতিলাল রায় চন্দননগরে এসে আরও দু'চারজন বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। মুখে মুখে তাঁদের এক অভিনব সঙ্গীত—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক—'। এই গান শুনে জনসাধারণের অনেকে পুলকিত হয়ে বেরিয়ে এল

প্রথম বৈপ্লবিক হত্যা ও ডাকাতি প্রচেষ্টা

বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববঙ্গের লাট নিযুক্ত হলেন ফুল্লার সাহেব। তাঁর সময়ে স্বদেশী দলন অতিমাত্রায় চলেছিল। বরিশাল প্রাদেশিক সভা ভঙ্গ হয় তাঁরই নির্দেশে। তাঁর আমলে ছাত্রদের কোন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। শুধু 'বন্দে মাতরম্' বলার অপরাধে অনেককে দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল। বরিশালের সভাভঙ্গ বিষয়ে হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন—'সেই সময় (১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল) পুণ্যো-শীল-বরিশালের প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যে স্মরণীয় দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তাতে বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের আদিগুরু সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার, বিপিনচন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ, উপাধ্যায়, কাব্যবিশারদ ও অন্য অনেক নেতা এবং ডেলিগেটদের নাকি সিপাহীর রেগুলেশন্ ডাণ্ডার—কাউকে কাউকে স্বাদ আর কাউকে বা স্বাদের বিভীষিকা—উপভোগ করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পৈতৃক প্রাণটা বাঁচাবার জন্য খানায় পড়তে, প্রাচীর ডিঙ্গোতে আর পগার পার হতেও হয়েছিল। অধিকন্তু বহুকালের জন্য সেখানে পিটুনী-পুলিসও বসান হয়েছিল। এর ফলে এই ঘটনার ঠিক পরেই কিন্তু বিপ্লববাদের মন্ত্রগুলো

কাকের কাণে সহজে ঢুকত; এমন কি, অনেক হোমরা-চোমরা ডাইরেক্টরও বিপ্লবের খেয়ালে সই দিতেন।

'এই সকল কারণে দেশের অনেক লোকের জাতক্রোধটা ফুলার সাহেবের ওপর ঘনিয়ে উঠেছিল। ফুলার সাহেবকে কেউ বধ করেছে, ঘরের দরজা-ভেজিয়ে আরাম-খুরসিতে বসে এই খোস্ খবরটা শোনবার জন্যে তখন অনেক গণ্যমান্য লোক কায়মনোবাক্যে প্রত্যাশা করছিলেন। এমন কি, ঘাতককে দু'পাঁচ হাজার বকসিস্ দেয়ার অঙ্গীকারও দু'চারজন ক'রে ফেলেছিলেন।

'আমাদের বারীণ এ সুযোগ ছাড়বার পাত্রই ছিল না। কে একজন বারীণের হাতে নগদ ১ হাজার বায়নাস্বরূপ অগ্রিম দিয়ে ফেলেছিলেন।···

'এক হাজার টাকা পেয়ে দুটো তথাকথিত বোমা আর দুটো রিভলভার নিয়ে বারীণ Reconoiter (অর্থাৎ বধ্যকে আক্রমণের স্থান ও সুযোগাদি অনুসন্ধান) করবার জন্য ফুলার লাটের গ্রীষ্মাবাস শিলংএ যাত্রা করল। বন্দোবস্ত করে গেল, সেখান থেকে টেলিগ্রাম করলে কলকাতা থেকে একজন হত্যাকারী পাঠানো হবে।

'হত্যাকারী হিসাবে প্রথমে মেদিনীপুরের একজনের নাম ঠিক করা হয়। পরে কি কারণে যেন তিনি যেতে পারেন না। তারপর ক্ষুদিরামের নাম ওঠে, কিন্তু পরে তার নামও বাদ দেওয়া হয়। সব শেষে মেদিনীপুরে আর একজনকে পাঠানো

হয় (হেমচন্দ্র কানুনগো ?)। যেদিন বারীন্দ্র 'তার' করে. শিলং থেকে সেদিনই সন্ধ্যেবেলা ভূপেন দত্ত হত্যাকারী. ট্রেণে তুলে দিয়ে এলেন। সময়টা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মে মাস।'

আয়োজনের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হত্যাকারী একরকম মানসিক অক্ষমতার জন্যেই কার্য সমাধা করতে পারে নি। বরং একটু লোক জানাজানি হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক হত্যা চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ফুলার সাহেব ওখান থেকে রংপুর চলে যান। তখন ঠিক হয় রংপুরেই আর একবার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থার জন্য আরও কিছু টাকার প্রয়োজন। তখনই অরবিন্দ—যিনি কার্যক্ষেত্রে 'ক-বাবু' নামে পরিচিত স্বদেশী ডাকাতির পরিকল্পনা করেন এবং নরেন গোসাইকে রংপুরে ডাকাতি করবার আদেশ দেন। রংপুরেই প্রথম স্বদেশী ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। রাওলাট কমিশনের রিপোর্টেও সে-কথার উল্লেখ আছে।

লাট সাহেবকে প্রথম হত্যা-প্রচেষ্টার মত প্রথম স্বদেশী ডাকাতিও সফল হয় নি। প্রথম হত্যাকারী যিনি ছিলেন, প্রথম ডাকাতির প্রচেষ্টার অন্যতম কর্মী ছিলেন তিনিই। হত্যার সময় যেমন হয়েছিল ডাকাতি করতে এসে মনের মধ্যে ধিক্কার জেগেছিল এবং শেষ পর্যন্ত নানাকারণে ডাকাতি আর করতে হয় নি। হত্যা করতে যাওয়ার মধ্যে তবু কিছু সান্ত্বনা আছে। কারণ সাহেবকে হত্যা করা হচ্ছে দেশ-

াসীকে নয়। কিন্তু ডাকাতি করতে গেলে দেশবাসীরই ক্ষতি! হেমচন্দ্র কানুনগো এই সম্বন্ধে লিখছেন—'বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠনের সুরুতে আর্থিক সমস্যা সমাধান জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বিত হয়েছিল, তার মধ্যে ডাকাতিই ছিল প্রধান। বিপ্লবচেষ্টার অন্যান্য ব্যাপারের মত এটাও বঙ্কিমবাবুর নভেল থেকে নেওয়া হয়েছিল। আর একটা বড় সমর্থন এই ছিল যে রাশিয়ার বিপ্লববাদীরাও নাকি ডাকাতি করত; কাজেই এদেশে ডাকাতী করা উচিত কি অনুচিত, অথবা কি রকম ডাকাতী করা উচিত, সে বিষয় কোন দ্বিধা আমাদের মনে ত আসেই নি, নেতাদের মনে এসেছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি, কারণ, নেতাদের মধ্যে ডাকাতির বিরুদ্ধে একটুও প্রতিবাদ করতে কাউকে কখনও শুনিনি।

'...গুপ্ত সমিতির সুরুতে আমাদেরও এই ধারণা ছিল যে, সরকারী কোন অফিসের রেলওয়ে কোম্পানীর বিদেশী বণিকের টাকাই ডাকাতি করতে হবে। সরকারী অফিসের টাকা যে দেশের লোকেরই টাকা অর্থাৎ তা যে দেশেরই আয়-ব্যয়ের তহবিলের টাকা, আর তার ক্ষতি বৃদ্ধির জন্য যে, দেশের লোকেই দায়ী, সে জ্ঞান আমাদের ছিল না। টাকা বা নোটজালের কল্পনাও অনেকের মাথায় এসেছিল, তা কাজে পরিণত হয়েছিল বলে শুনি নি।

মোট কথা, ক-বাবুর নির্দেশমতই ডাকাতি করার সিদ্ধান্ত করা হয় এবং ডাকাতি করা উচিত কি অনুচিত সে বিষয় চিন্তা

করে কিছু দেখা হয় নি। তবে, ক-বাবু ডাকাতি করবা
পরামর্শ দিয়েছিলেন বটে কিন্তু কোথায় করতে হবে তা কি
বলে দেন নি। কাজেই তাই নিয়েই কিছু যা আলোচনা
পরামর্শাদি হয়েছিল। পাটের মহাজন, রেলওয়ে ষ্টেশন,
পোষ্ট অফিস, স্থানীয় বড়লোক ইত্যাদি অনেক নাম উঠেছিল।
কিন্তু কোনটাই শেষ পর্যন্ত সুবিধাজনক মনে হয় নি। হেমচন্দ্র
লিখছেন—'কোথাও কিন্তু বড় সুবিধা হল না, অর্থাৎ নিরাপদ
বা অহিংস ডাকাতির সম্ভাবনা খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না।
অবশেষে একজন সন্ধান দিলেন, রংপুর সহর থেকে ১২।১৩
মাইল দূরে, তাঁর বাড়ীর নিকট গাঁয়ে এক বিধবার নাকি হাজার
হাজার নগদ টাকা আছে। তার বাড়ীর আশে পাশে এমন
পুরুষমানুষ না কি কেউ ছিল না যে, ডাকাতদের একটুও বাধা
দিতে অর্থাৎ হিংসা করতে পারে। তখন সর্বসম্মতিক্রমে সেই
বিধবার বাড়ীতেই স্বদেশী ডাকাতির বউনী করা স্থির হল।'
হেমচন্দ্র এই ডাকাতির নাম দিয়েছিলেন 'বিধবার ঘটি চুরি।'

কথা ছিল নরেন গোসাই একদল নিয়ে যাবে আর
হেমচন্দ্র একদল নিয়ে যাবেন। সঙ্গে থাকবে একজন স্থানীয়
পাকা ডাকাত—কলাকৌশল শেখাবার জন্য। আয়োজন সবই
সম্পূর্ণ কিন্তু যেদিন রাত্তিরে কাণ্ডটা হবে সেদিন বাড়ী থেকে
বেরোবার পর ওরা জানতে পারলে যে স্থানীয় দারোগা কি
একটা কাজে নাকি সে-রাত্তিরে সেই গ্রামে যাচ্ছেন। কাজেই
এত আয়োজন, শলা-পরামর্শ সমস্তই পণ্ডশ্রম হয়ে গেল।

তাছাড়া বিধবার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করবার প্রবৃত্তি অনেকেরই ছিল না। নিতান্ত সমিতির স্বার্থের জন্য তাঁরা রাজী হয়েছিলেন এবং কথা ছিল দেশ স্বাধীন হলে বিধবাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। যাক্, কিছুদিন পর আবার এক নতুন ডাকাতির জন্য পরামর্শসভা বসল। তবে এবারে মতভেদটা ছিল তীব্র। হেমচন্দ্রের সঙ্গে বারীন্দ্রের মতের মিল হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আর ডাকাতি করা হল না। খবর এল লাটসাহেব নাকি গোয়ালন্দে যাচ্ছেন সেখানে পূর্ববঙ্গের তরফ থেকে তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া হবে এবং তিনি সেখান থেকে বোম্বে যাত্রা করবেন। ঠিক হল এবার গোয়ালন্দে তাঁর জীবননাশের আর একবার চেষ্টা করা হোক।

চেষ্টা হল। এবারেও হেমচন্দ্র গেলেন, সঙ্গে গেলেন প্রফুল্ল চাকী, দুঃখের বিষয় এবারেও চেষ্টা ব্যর্থ হল। ওঁদের চোখে ধুলো দিয়েই লাটসাহেব তাঁর গন্তব্য-পথে চলে গেলেন।

বারীন্দ্র ও কানাইলালের যোগাযোগ

বাংলায় আগুন জ্বলেছ। হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও, প্রচেষ্টার কথাটাই ছড়িয়ে পড়েছে আগুনের মত। এইটেই ছিল নাকি বারীন্দ্রের নীতি। বারীন্দ্র চেয়েছিলেন এই চেষ্টা গুলোকেই প্রচারের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে, বাংলার যুবকদের মনকে জাগিয়ে তুলতে। আগেই বলেছি কানাইলাল নিজ চেষ্টাতেই চন্দননগরে কয়েকটি সমিতি কেন্দ্র ও শাখা স্থাপনা করেছিলেন। এই সমিতি পরিচালনা ব্যাপারেই বারীন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বারীন্দ্র কুমার 'যুগান্তরে'র সংশ্রব ছেড়ে দিয়ে মাণিকতলার বাগানবাড়ীতে কেন্দ্র স্থাপনা করেন। এই কাজ ব্যয়সাপেক্ষ, তাই তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। কানাইলাল তখন সবে মাত্র কেন্দ্র স্থাপনা করেছেন। সহায়ের মধ্যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ছাত্র-বন্ধু মাত্র। নিজেদেরই অর্থের প্রয়োজন তার ওপর আবার অপরকে সাহায্য করা! কিন্তু কানাইলাল দমে যাবার পাত্র নন। তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করে প্রথমে মাত্র পাঁচটি টাকা পাঠালেন। তার পর দশ টাকা এমন কি পরের মাসে পনেরো টাকা পর্যন্ত পাঠাতে

পেরেছিলেন। এই অর্থসংগ্রহ ব্যাপারেই মতিলাল রায়ের স্পর্শে আসতে হয় কানাইলালকে। তখন মাঘ কিংবা ফাল্গুন মাস। জ্যোৎস্না রাত্রি। কানাইলাল মতিলাল-রায়ের বাড়ীতে এসে গল্প আরম্ভ করে দিলেন। অনেকক্ষণ পর তাঁরা রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। পথে পায়চারী করে বেড়াতে বেড়াতে কথা হতে লাগল। দেশের কথা, সমাজ মঙ্গলের কথা হতে হতে শেষে কানাইলাল স্পষ্টস্বরে বললেন, এই আমাদের দেশ, এর স্বাধীনতা চাই, এবং তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও হচ্ছে, খবর রাখ কি? মতিলাল রায় তখন বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা নেন নি, সামান্য ছাত্র মাত্র, দেশের কল্যাণ কামী মাত্র। কানাইলালের প্রশ্নের প্রতিটি শব্দে যেন বিশ্বাস আর নিষ্ঠার আগুন জ্বলে উঠল। মতিলাল রায় চকিত আনন্দে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায়? কে করছে?' কানাইলাল বললেন, 'সে কথা এখন বলব না। জেনে রাখ বঙ্কিমের 'আনন্দ মঠ' আজ আর স্বপ্ন নয়। অসংখ্য সন্তান একত্র হয়ে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছে। আমিও যাবো, তোমারও সাহায্য চাই।" বোঝা গেল কানাইলাল মনস্থির করেছে। বারুদের স্তূপ উত্তপ্ত ও পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। বিস্ফোরণের আর বড় বেশি দেরী নেই।

ইতিমধ্যে বাংলার নানাস্থানে কয়েকটি বৈপ্লবিক হত্যা-প্রচেষ্টা সংঘটিত হয়ে গেছে। সেই সময়কার অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন উপেন্দ্রনাথ—'মাণিকতলার বাগানে যখন আশ্রমের

সূত্রপাত হইল তখন সেখানে চার পাঁচ-জনের অধিক ছেলে ছিল না। হাতে একটিও পয়সা নাই, ছেলেরা সকলেই বাড়ি ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহাদের মা বাপদের কাছ থেকেও কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। অথচ ছেলেদের আব কিছু জুটুক আর নাই জুটুক, দুবেলা দুমুঠো ভাত ত' চাই! দু'একজন বন্ধু মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, আর স্থির হইল যে, বাগানের শাকসব্জীর ক্ষেত করিয়া বাকী খরচটা উঠাইয়া লওয়া হইবে। বাগানে আম জাম কাঁঠালের গাছও যথেষ্ট ছিল। সেগুলা জমা দিয়াও কোন্ না দু-দশ টাকা পাওয়া যাইবে? আর আমাদের খাইতেও বেশি খরচ নয়—ভাতের উপর ডাল আর একটা তরকারী। অধিকাংশ দিনই আবার ডালের মধ্যে দুই চারিটা আলু ফেলিয়া দিয়া তরকারীর অভাব পুরাইয়া লওয়া হইত। সময়াভাব হইলে খিচুড়ির ব্যবস্থা। একটা মস্ত সুবিধা হইল এই যে, বারীণ তখন ঘোরতর ব্রহ্মচারী। মাছের আঁশ বা পেঁয়াজের খোসাটী পর্যন্ত বাগানে ঢুকিবার হুকুম নাই; তেল লঙ্কা একেবারেই নিষিদ্ধ। সুতরাং খরচ কতকটা কমিয়া গেল।

'উপার্জনের আরও একটা পথ বারীন্দ্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—হাঁস ও মুরগী রাখা!...আমাদের বাজে খরচের মধ্যে ছিল চা। ওটা না থাকিলে সংসার নিতান্তই ফিকে ফিকে, অনিত্য বলিয়া মনে হইত। বিশেষতঃ বারীন চা বানাইতে সিদ্ধহস্ত। তাহার হাতের গোলাপী চা, ভাঙ্গা

নারিকেলের মালায় ঢালিয়া চক্ষু বুজিয়া তারিফ করিতে করিতে খাবার সময় মনে হইত যে, ভারত উদ্ধারের যে কয়টা দিন বাকী আছে, সে কয়টা দিন যেন চা খাইয়াই কাটাইয়া দিতে পারা যায়। প্রথম দিনেই বারীন আইন জাহির করিয়া দিল যে, নিজে রাঁধিয়া খাইতে হইবে। এক আধ জন ত রাঁধিবার ভয়ে বাগান ছাড়িয়া পলাইয়া গেল! কিন্তু তা বলিয়া বাগানের ভিতর ত বাহিরের লোককে ঢুকিতে দেওয়া যায় না—বিশেষতঃ পয়সার অভাব।...থালা ঘটি বাটির নাম গন্ধ বাগানে বড় বেশি ছিল না। প্রত্যেকের এক একটি নারিকেলের মালা আর একখানি করিয়া মাটির সানকি ছিল; তাহাই আহারাদির পর ধুইয়া মুছিয়া রাখিয়া দিতে হইত। কাপড় সকলেই নিজের হাতে সাবান দিয়া কাচিয়া লইত, যাহারা একটু বেশি বুদ্ধিমান, তাহারা পরের কাচা কাপড় পরিয়াই কাজ চালাইয়া দিত।

'ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের নানা জেলা হইতে প্রায় ২০ জন ছেলে আসিয়া জুটিল।...বাগানের কাজকর্ম যখন আরম্ভ হইয়া গেল, তখন ছেলেদের বারীনের কাছে রাখিয়া দেবব্রত ও আমি আর একবার আশ্রমের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে বাহির হইলাম।...প্রথমেই গিয়া এলাহাবাদে একটা প্রকাণ্ড ধর্ম-শালায় দুই চারিদিন পড়িয়া রহিলাম।...প্রয়াগ হইতে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া এক ধর্মশালায় কিছুদিন পড়িয়া রহিলাম।... বারীনের চিঠি আসিল—"শীঘ্র ফিরিয়া এসো।"...বারীনের

চিঠি পাইয়াই তল্পি-তল্পা গুছাইয়া রওনা হইলাম। বাগানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম একেবারে "সাজ সাজ" রব পড়িয়া গিয়াছে।...সে সময় কিংসফোর্ড সাহেব একে একে সব স্বদেশী কাগজওয়ালাদের জেলে পুরিতেছেন। পুলিসের হাতে এক তরফা মার খাইয়া দেশসুদ্ধ লোক হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। যাহার কাছে যাও, সেই বলে—"না এ আর চলে না। ক'বেটার মাথা উড়িয়ে দিতেই হবে।" তথাস্তু...

'পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যখন সাহেবদের মধ্যে ছোট লাট আণ্ড্রু ফ্রেজারের মাথাটাই সব চেয়ে বড়, তখন তাঁহারই মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা আগে থেকে করা দরকার। কিন্তু লাট-সাহেবের মাথার নাগাল পাওয়া ত সহজ কথা নয়। ডিনামাইট কার্টিজ লাটসাহেবের গাড়ির তলায় রাখিয়া দিলে কাজ চলিতে পারে কি না তাহা পরীক্ষার জন্য চন্দননগর ষ্টেশনের কাছাকাছি রেলের উপর গোটা কয়েক ডিনামাইট কার্টিজ রাখিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু উড়া তো দূরের কথা— ট্রেণখানা একটু হেলিলও না। শুধু কার্টিজ ফাটার গোটা দুই ফট্ ফট্ আওয়াজ শূন্যে মিলিয়া গেল, লাটসাহেবের একটু ঘুমের ব্যাঘাত পর্যন্ত হইল না। দিনকতক পরে শোনা গেল যে, লাট সাহেব রাঁচি না কোথা হইতে কলিকাতায় স্পেশ্যাল ট্রেণে ফিরিতেছেন। মেদিনীপুরে গিয়ে নারায়ণগড় ষ্টেশনের কাছে ঘাঁটি আগলানো হইল। বোমাবিদ্যায় যিনি পণ্ডিত তিনি পরামর্শ দিলেন যে, রেলের জোড়ের মুখের নীচে

...র মধ্যে যেন বোমাটা পুঁতিয়া রাখা হয়। তাহার পর সময়মত তাহাতে 'শ্লো-ফিউজ' লাগাইয়া আগুন ধরাইয়া দিলেই কার্যোদ্ধার হইবে। কিন্তু লাটসাহেবের এমনই অদৃষ্টের জোর যে, বোমা পুঁতিবার দিন আমাদের ওস্তাদজী পড়িলেন জ্বরে, আর যাঁহারা কেল্লা ফতে করিতে ছুটিলেন তাঁহারা একেবারে "ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।" কাজেই বোমাও ফাটিল, রেলও বাঁকিল, গাড়ী উড়িল না। তবে ইঞ্জিনখানা নাকি জখম হইল, এবং খড়গপুর ষ্টেশন হইতে আর একটা ইঞ্জিন লইয়া গিয়া লাট-সাহেবের স্পেশ্যালকে টানিয়া আনিতে হয়।

'পুলিসের কর্তারা গাড়ী ভাঙ্গার আসামী ধরিবার জন্য ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। সুতরাং আসামীরও অভাব হইল না। জনকতক রেলের কুলিকে ধরিয়া চালান করা হইল। তাহারা নাকি পুলিসের কাছে আপনাদের অপরাধও স্বীকার করিল। জজ সাহেবের বিচারে তাহাদের কাহারও পাঁচ কাহারও বা দশ বৎসব দ্বীপান্তরের হুকুম হইল।'

দেখা যাচ্ছে. মাণিকতলা বাগানের ছেলেদের প্রথম কীর্তি ফ্রেজার হত্যা-প্রচেষ্টা। চেষ্টা একবার নয়, দুবার। প্রথম চন্দননগরে, দ্বিতীয় নারায়ণগড়ে। দলের মধ্যে হেমচন্দ্র ফুলার বধের বেলায় হত্যাকারীর কাজ করেছেন। ফ্রেজার বধের প্রথম চেষ্টায় কে কে ছিলেন জানা নেই তবে দ্বিতীয়বারে যিনি ছিলেন তাঁর বিষয়ে হেমচন্দ্র স্পষ্টই লিখছেন—'...বারীণ

খড়্গপুর থেকে শ্রীমান বিভূতিকে খড়্গপুরের প্রায় দশ কি মাইল দূরে নারায়ণগড থানার অন্তর্গত একটা নির্জন স্থ রেল লাইনের তলায় কয়েক পাউণ্ড ডিনামাইট পুঁতে দিয়ে আসতে পাঠিয়েছিল।'

ফ্রেজার সাহেবের গাড়ী উড়িয়ে দেবায় চেষ্টা হয় ৬ই ডিসেম্বর ১৯০৭ সাল। তার ঠিক ১৭ দিন পর ২৩শে ডিসেম্বর ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ অ্যালেনকে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে বিপ্লবীর দল গুলী করে গুরুতর জখম করে। এই কাজ যে কে বা কারা করেছিল জানা নেই। বারীন্দ্র নিজে বলেছেন তাঁর দল এ কাজ করে নি। অবশ্য দলের অনেকেই নিজের নামে এটা চালিয়ে দিত। তবে বারীন্দ্রের দল ছাড়া অন্য কারও দ্বারাই সম্ভবত এ কাজ হয়েছিল। হেমচন্দ্র লিখছেন—'কলকাতায় বিপ্লববাদীরা অনেক ছোট ছোট দলে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। তার মধ্যে চার পাঁচটা দল প্রধান ছিল।' অবশ্য হেমচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও লিখেছেন—'...কলকাতায় যতগুলি বৈপ্লবীক দল ছিল, তাদের মতে একমাত্র বারীণই, ভালই হোক আর মন্দই হোক, বিশেষ কিছু বৈপ্লবিক কায করবার চেষ্টা কচ্ছিল।'

অ্যালেন সাহেবকে গুলী করবার পর কুষ্টিয়ায় পাদরী হিকেন বোথামের ওপর গুলি চলল। সারা দেশ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বাঙ্গালী জাত এ কি আগুন খেলায় মেতে উঠেছে! প্রত্যেক সমিতিতে সভ্যদের মধ্যে এক আলোচনা এক চিন্তা। কে কি করবে, কোন পথে যাবে তাই নিয়ে

…বষণা! পথে-ঘাটে সর্বত্র এক যুবক যদি আর এক যুবকের সঙ্গে গোপনে কিছু কথা বলে তা হলেই লোকেদের চোখে সন্দেহ ঘনায়—কোন মতলব হচ্ছে নাকি? কানাইলালের দলেও প্রশ্ন উঠল। কানাইলালের দিকে মতিলাল একদৃষ্টে তাকিয়ে—! কানাইলাল বললেন, কি দেখছো? মতিলাল বললেন, এ সব কি? এ যে স্বপ্ন! কানাইলাল হঠাৎ উচ্চরবে হেসে উঠলেন। বললেন, এমন স্বপ্ন এখন হতে নিত্য দেখবে! বেশি কথা বলবার পাত্র নন কানাইলাল। কিন্তু যারা বোঝবার তারা বোঝে। চন্দননগরে ঢেউ এল বলে!

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি চন্দননগরে হাটখোলা নামে এক জায়গায় এক স্বদেশী সভার আয়োজন করা হয়। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সে সভায় অতিথি হিসাবে এসেছেন। ফরাসী সরকার নির্দেশ দিলেন সভা নিষিদ্ধ। সভা সুরু হয়েছে, অসংখ্য লোক এসে জড় হয়েছে, এমন সময় তখনকার মেয়র মঁসিয়ে তার্দিভিলের অধিনায়কত্বে বিশ-পঁচিশজন বন্দুকধারী মাদ্রাজী পুলিশ সভাস্থান ঘিরে দাঁড়াল। ফলে সভার কাজ বন্ধ রাখতে হল। কিন্তু যুবকদের মন তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে সভা বসল। সভায় স্থির হল সাহেবের বাড়ী আক্রমণ করতে হবে। শতাধিক যুবক এই সভায় উপস্থিত ছিল। তারা লাঠি, সড়কি, খাঁড়া বন্দুক সংগ্রহ করবার জন্যে মেতে উঠল। পরিস্থিতি জটিল হয়ে আসছে—এমন সময় কানাইলাল কয়েকজন সহচরকে

সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি এদের থামতে বললেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, পরে এর ব্যবস্থা হবে। সত্যনিষ্ঠ কানাইলাল, দেশহিতে-উৎসর্গীকৃত-প্রাণ কানাইলালের কথায় কেউ অবিশ্বাস করতে পারলে না। ক্ষুণ্ণমনে সকলেই সভা ত্যাগ করলে। অবশ্য সত্যিই প্রতিশোধের ব্যবস্থা পরে হয়েছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে তার্দিভিলের শয়ন-কক্ষে বোমা নিক্ষিপ্ত হল। হেমচন্দ্র কানুনগো যিনি সদ্য সদ্য ইউরোপ থেকে বোমা ইত্যাদি তৈরী করার কৌশল গোপনে শিখে এসেছেন তিনি নিজে লিখেছেন যে এই বোমা তৈরী করবার ফরমাস দিয়েছিলেন বারীন্দ্র তাঁর ওপরেই। হেম-চন্দ্রের নিজের কিন্তু তার্দিভিল হত্যা ব্যাপারে বিশেষ সমর্থন ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল এখন ঐ সব ইতস্তত হত্যাকাণ্ড না করে একটা বাড়ীতে আড্ডা করে সেখানে কয়েকজন যুবককে আগে বোমা-বন্দুক ইত্যাদি তৈরী করা শিখানোর ব্যবস্থা করা। শেখা হলে তারপর সুপরিকল্পিত উপায়ে, বিরাট ব্যাপকভাবে কাজ আরম্ভ করা উচিত।

কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য বোমার স্কুল ও কারখানা খোলা হল। অনেক চেষ্টার পর ভবানীপুর অঞ্চলে একটা সুবিধা-মত বাড়ী পাওয়া গেল। চার পাঁচজন ছাত্র জুটেছিল প্রথমে। তাদের মধ্যে অন্যতম কানাইলাল। হেমচন্দ্র লিখছেন—'তার সঙ্গে এইখানে প্রথম আলাপ হয়। মুখে কথা ছিল না বললেই হয়, কিন্তু খুব বুদ্ধিমান অথচ ম্যালেরিয়া

রোগী।' বস্তুত দেখা যাচ্ছে এই সময় থেকেই কানাইলাল সরাসরি ভাবে কোলকাতার দলে গিয়ে যোগ দিলেন। তার আগে চাঁপাতলায় আড্ডা থাকতে কানাইলাল একজন সঙ্গী ও কিছু বারুদ (gun powder) সঙ্গে নিয়ে বারীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ঐটাই ছিল 'যুগান্তরের' অফিস, ঠিক মেডিকেল কলেজের দক্ষিণে। কানাইলাল এসে দেখলেন একদিকে ত সংবাদ পত্র ছাপবার ও পরিচালনা করববার ব্যবস্থা রয়েছে আর অন্যদিকে বারীন্দ্র সোডার বোতলে ঠেসে ঠেসে বারুদ গাদছেন। বহু লোক আসছে যাচ্ছে, কিন্তু সবার অলক্ষ্যে বারীন্দ্র মহা এক প্রলয়-স্বপ্ন রচনা করে চলেছেন। বারীন্দ্র কানাইলালকে বলেছিলেন, পরীক্ষার পর এস। কানাই-লালও সেই কথা মত পরীক্ষা দিয়ে আসেন। বাড়ীর লোকে মনে করে কোলকাতায় এম-এ পড়বার জন্যে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পিসিমার বাড়ী যাচ্ছেন। কানাইলালের যোগ দিতে দেরী হওয়ার আর একটা সাংসারিক কারণ ছিল। এই সময় অর্থের তাগিদে তাঁকে দেড় মাসের জন্য ই-আই-রেলের এজেন্ট আফিসে কাজ করতে হয়েছিল।

কিংসফোর্ড বধের ষড়যন্ত্র

চাঁপাতলার বাগানবাড়ী থাকতে ফুলার বধের চেষ্টা হয়েছিল। মাণিকতলার বাড়ীতে প্রথম প্রচেষ্টা ফ্রেজার বধ তারপর কিংসফোর্ড বধের ষড়যন্ত্র। আগেই বলা হয়েছে 'বন্দেমাতরম্' সম্পর্কিত মামলার দিনে আদালতে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের আদেশে ১৪ বছরের ছেলে সুশীল সেনের ওপর ১৪ ঘা বেত মারা হয়। এই সুশীল সেন তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যোগ দেয় গুপ্ত সমিতিতে। আর গুপ্ত সমিতি সিদ্ধান্ত করে যেমন করে হোক কিংসফোর্ডকে সরাতে হবে। এমন কি প্রথমে প্রস্তাব করা হয় সুশীল সেনকে দিয়েই কার্য সমাধা করা হবে। কিন্তু পরে এ সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করা হয়।

কিংসফোর্ডকে হত্যা করবার প্রথম চেষ্টা হয় কোলকাতায়। পরিকল্পনাটি বড় সুন্দর। ব্যাপারটা সম্বন্ধে হেমচন্দ্র কানুনগো লিখছেন—'একখানা বড় বইয়ের মাঝখানে যায়গা করে এমন-ভাবে বোমাটা রাখা হয়েছিল যে, বইখানা খুললেই বোমা ফেটে যেত। বইখানা একটা ফিতা দিয়ে বাঁধা ছিল। একখানা লম্বা খামের খানিকটা বইয়ের ভেতর থেকে একদিকে এমন ভাবে বেরিয়েছিল যে, ফিতে না খুলে টানলে বেরিয়ে আসত না।

'জানা গেছল, মিঃ কিংসফোর্ড মিসেস মক্কের গ্রাণ্ড হোটেলে থাকতেন এবং সাড়ে ন'টার পর নিজের অফিস-যানে কোর্টে যেতেন। গাড়ীতে ওঠবার সময় ঐ বইখানা একদিন তাঁর হাতে দিতে গিয়ে জেনেছিল তিনি তার ঠিক আগের দিন টালিগঞ্জের বাড়ীতে উঠে গেছেন। তারপর টালীগঞ্জের বাড়ী খোঁজ করে—আর একদিন সন্ধ্যেবেলা সেটা তার হাতে দিয়ে এল। কিন্তু তাঁর এমনই জোর বরাত, বইখানা না খুলেই আলিমারীতে রেখে দিয়েছিলেন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, উক্ত লেফাফাখানিতে কি চিঠি ছিল তা পড়বার প্রবৃত্তি তাঁর হয় নি।

'পরে আমরা যখন আলিপুর জেলে বিচারাধীন, তখন নরেন গোঁসাইর হত্যার পরে আমাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় একজন পুলিসকে ঐ সংবাদ দিলে, মুজফরপুরে উক্ত মিঃ কিংসফোর্ডের বইয়ের আলমারী হতে বোমা সমেত ঐ বইখানি উদ্ধার করা হয়েছিল। এ সম্বন্ধে রাউলাট কমিশন রিপোর্টে যা লিখিত আছে তা নীচে উদ্ধৃত হল।

'ভাবার্থ :—কিংসফোর্ডকে যখন মারবার মতলব করা হয়েছিল, তার দশদিন আগেই পুলিস খবর পায়। পর বছর কোন বিখ্যাত বিপ্লবপন্থী জেলখানায় থাকতে থাকতে বলে যে উক্ত দুর্ঘটনার পূর্বে কিংসফোর্ডকে একটা বইয়ের মধ্যে বোমা পাঠান হয়েছিল। অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, কিংসফোর্ড

তা পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাওয়া বই ফেরৎ এসেছে মনে করে তা আর খোলেন নি।'

প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর কিংসফোর্ড মজঃফরপুরে বদলী হয়ে আসেন। দ্বিতীয় চেষ্টা করা হয় মজঃফরপুরে। এবং এইবার পাঠান হয় স্বনামধন্য, প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে। ইতিমধ্যে ভবানীপুরের আড্ডার সন্ধান পুলিস পেয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে শ্যামবাজার গোপীমোহন দত্ত লেনে আড্ডা সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। কানাইলালও এই আড্ডায় চলে এলেন। হেমচন্দ্র লিখছেন—'গোপীমোহন দত্ত লেনে প্রথমে যে তিনটা বোমা তয়ের হয়েছিল, তার একটা পরীক্ষা করে দেখা হল আশানুরূপ কায দেবে।' অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে কিংসফোর্ডকে সরিয়ে ফেলবার অস্ত্রটি তৈরী হল হেমচন্দ্রের কারখানায়, কানাইলাল প্রভৃতির সহ-যোগিতায়। প্রথমবারের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ঠিক করা হয়েছিল এবারে দুজনকে পাঠাতে হবে। এই দুজনের এক-জনকে আনানো হল মেদিনীপুর সমিতি থেকে কাউকে কিছু না বলে। ইনি হলেন ক্ষুদিরাম বসু। দ্বিতীয় জনকে—প্রফুল্ল চাকীকে অন্য এক দল থেকে চেয়ে আনা হল। পরস্পর পরস্পরের অচেনা, কাজেই আশা করা গেল এবারে কার্য সমাধা হবে।

এবারে কিন্তু একটু বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হল। কারণ সকলেরই সন্দেহ হচ্ছিল যে হয়ত পুলিস গোপীমোহন

দত্ত লেনের বাড়ীর সন্ধান পেয়েছে। হেমচন্দ্র লিখছেন—
'তাদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ছিল যে, সেখানে অনুষ্ঠান সব ঠিক হয়ে গেলে কায হাসিল করবার পূর্বে সাংকেতিক প্রথায় আমাদের খবর দেবে। তখন আমরা নিজেদের বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকব।

'এই অবসরে আমরা প্রস্তুত হতে লেগে গেলাম। কথা স্থির হল, সকলে নিজ নিজ বাড়ী বা আড্ডা থেকে বিদ্রোহসূচক জিনিষপত্র সরিয়ে ফেলবে। এমন কি, সন্দেহজনক সামান্য চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলবে। বিদেশী শিক্ষার্থী, আর যাদের সহরের বাইরে নিজের বা আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে থাকবার সুবিধে আছে, তারা সহর ছেড়ে চলে যাবে।

'...এর আগে যে সকল বৈপ্লবিক মারাত্মক ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, তার পূর্বে বা পরে এরকম সাবধান হওয়ার কথাই ওঠে নি। এবার অন্যের suggestion মত সতর্কতা অবলম্বনের কথা ওঠাতে বারীন রাজী ত হলই না, অন্যকেও সে বিষয় মনযোগী হতে দিল না।

'মুরারী পুকুর বাগানে, যেখানে যেমনটি ছিল, সেখানে তেমনই রইল। গোপীমোহন দত্তের লেনে যে দু'জন বিদেশী ছিল, তারা সুবোধ বালকের মত সরে পড়ল। রইল কেবল কানাই ও নিরাপদ। যন্ত্রপাতি ও সন্দেহজনক সমস্ত জিনিষ পাঁচ-ছটা বাক্সে পুরে ফেলা হয়েছিল। উল্লাস ভায়াকে ঐ ভার দেওয়া হয়েছিল যে, সে সন্ধ্যের পর ঐ সব মাল সমেত

নিয়ে কয়লাঘাটে একখানা নৌকা পৃথকভাবে ভাড়া করে, শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তার বাবার ল্যাবরেটারীতে পাড়ি দেবে। উক্ত বাক্সগুলোর দুটোতে এমন অনেক যন্ত্রপাঁতি ও মাল-মসলা ছিল, যা যে কোন ল্যাবরেটারীতে থাকলে সন্দেহের কোন কারণ হত না। সেই বাক্সদুটো ছাড়া আর সব গঙ্গায় ডুবিয়ে দেবার কথা ছিল।

'কার্যতঃ কিন্তু তা হল না। বারীণের নির্ভীকতা অন্য সকলের মধ্যেও একটু আধটু সংক্রামিত হয়েছিল। কাযেই গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ীতে অনেক কিছু পড়ে রইল। চার পাঁচটা বাক্স দিনের বেলা ঘোড়ার গাড়ী করে হ্যারিসন রোডে উল্লাসের এক নিরীহ আত্মীয় কবিরাজের বাড়ীতে রাস্তার ধারে, বসবার ঘরে খাটের তলায় রেখে গেল। পুলিসও সঙ্গে সঙ্গে এসে সেই দিন থেকে সেখানে গুপ্ত পাহারায় নিযুক্ত রইল।'

এদিকে সাতদিন হয়ে গেল মজফরপুর থেকে কোন সাঙ্কেতিক খবর এল না। ২৯ শে এপ্রিল অরবিন্দ বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় খোলাখুলি ভাবে একটা প্রবন্ধ লিখে বসলেন। তিনি লিখেছিলেন,—"The fair hope of an orderly evolution of self-government which the first energy of the new movement had fostered is gone for ever. Revolution bare and grim is preparing her battle field moving down the

centres of order which were evolving a new cosmos and building up the materials of a gigantic downfall and a mighty new creation. We could have wished it otherwise. But God's will be done."

পরের দিন ৩০ শে এপ্রিল এম্পায়ার পত্রিকায় সংবাদ বার হল—"৩০ শে এপ্রিল রাত্রি ৮ টার সময় মিসেস এবং মিস কেনেডী, মজফরপুরের জজ মিঃ কিংসকোর্ডের গেটে ঢুকতে বোমার দ্বারা নিহত হয়েছেন।"

দেখা যাচ্ছে এবারের চেষ্টাও বিফল হল। দুজন নিরীহ স্ত্রীলোককে মেরে ভারতের কলঙ্কই পরোক্ষে বাড়ল, আসল কার্য সিদ্ধি কিছু হল না। শুধু তাই নয়। এবার আততায়ীরাও চটপট্ ধরা পড়ে গেল। প্রথম ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম রিভলভার সমেত। ক্ষুদিরামই পুলিসের কাছে প্রফুল্ল চাকীর কথা বলেছিলেন। অবশ্য ক্ষুদিরাম জানতেন না প্রফুল্ল চাকীর আসল নাম। তিনি নাম বলেছিলেন দীনেশ। সে যাই হোক ধুরন্ধর ইন্সপেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জী প্রফুল্ল চাকীকে চেহারা দেখেই সন্দেহ করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল চাকী নিজেকে ধরা দিলেন না। রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করলেন।

৩০ শে এপ্রিল এই বোমা-বিভ্রাট ঘটে। তার পরেই হেমচন্দ্র লিখছেন—'আমাদের কর্তা (অরবিন্দ), এ খবর

পাওয়া মাত্র বারীনকে ডেকে এনে আদেশ দিলেন, দলের সকলকে এ সংবাদ জানাতে আর সকলকে আড্ডা থেকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে দিতে। কিন্তু কোন আদেশই পালন করা তার ধাতে সয় না। তাই কাউকে কোন খবর না দিয়ে মাণিকতলার আড্ডায় গিয়ে বন্দুক, রিভলভার, গুলি, সেল ইত্যাদি পুঁতে ফেলতে সে হুকুম দিয়েছিল। আদেশ অনুযায়ী রাত ১২ টা পর্যন্ত ঐ সকল জিনিসের ওপর দুটি দুটি মাটি ঢাকা দেওয়া হয়েছিল। ঐ সময় নাকি পুলিসের কে একজন এসে এই রকম ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, 'সকালে অনেক পুলিস আসবে সাবধান।' একথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে নি। এদিকে হ্যারিসন রোডের উক্ত বামাল পূর্ণ বাক্সগুলোও সরান হল না। আমিও রাত পর্যন্ত কোন খবর না পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নিশ্চিন্ত হলাম।'

সর্বত্রই একটা ঢিলে ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সঙ্কল্পের তীব্রতার অভাব যেন প্রতিপদে। মারাত্মক ভুল করেছিলেন ক্ষুদিরাম। অনেকটা তাঁরই অসাবধানতার জন্যেই পুলিস ব্যাপারটা জানতে পেরে গেল। হেমচন্দ্র লিখছেন—'বোম ফাটলে রিভলভার ফেলে দেবার কথা ছিল; তা দেয় নি। উভয়ের, বিশেষ করে ক্ষুদিরামের ঐ জিনিষটার ওপর একটা অত্যধিক অনুরাগ ছিল। একটা রিভলভার পাবার জন্য সে বহুবার সাধ্য-সাধনা করেছিল; পাছে অপব্যবহার করে, এই ভয়ে তা দেওয়া হয় নি। মজফরপুরে যাবার দিন দুজনেই

দুটো নিয়েছিল। অধিকন্তু আর একটা সে (ক্ষুদিরাম) না বলে হস্তগত করেছিল। যেখানে রিভলভার রাখা হত সে জানত। দুটো রিভলভার পাতলা জামার দুপকেটে ঝুলছে, আর দুহাতে খাবার খাচ্ছে, এ হেন সময়ে বোমা-ফাটার পরের দিন রেল-ষ্টেশনে সে ধরা পড়ল।'

একাধিক হত্যা ব্যর্থ হবার প্রসঙ্গে কানাইলাল বলেছিলেন, টেরোরিষ্টদের একটি বড় দোষ এই যে, তাহারা লক্ষ্য সাধনের অপেক্ষা আত্মরক্ষার দিকেই অধিক ঝোঁক দিয়ে চলে—শুধু ব্যর্থতা নয়। এই ক্রুটি রেখে চললে ভবিষ্যতে এরা মারাত্মক ভুল করবে। শুধু মুখের কথা নয়, জীবনে কাজ দিয়ে কানাইলাল প্রমাণ করেছিলেন কি করে, কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও লক্ষ্য ভেদ করা যায়, যদি আত্মরক্ষার দুর্বলতাকে, হটকারিতাকে জয় করা যায়। তাই কানাইলাল শ্রেষ্ঠ সৈনিক।

গ্রেপ্তার

১৯০৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল বোমা-বিভ্রাট ঘটল আর ১লা মে কোলকাতার পুলিস ঠিক করলে বারীন্দ্রের সংস্পর্শে যে যেখানে আছে সবাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে, সব ঘাঁটি খানাতল্লাসী করতে হবে। কথামত কাজ হল। সেদিনই ভোররাত্রে অর্থাৎ ২রা মে ৩॥ টা ৪টার সময় নিম্নলিখিত

স্থানগুলি খানাতল্লাসী করে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়—

(১) মাণিকতলার মুরারী পুকুর বাগানে—বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, বিভূতিভূষণ সরকার, উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ইন্দুভূষণ-রায়, উল্লাসকর দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পরেশ মৌলিক, বিজয় নাগ, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বকসী, কুঞ্জলাল সাহা, পূর্ণ সেন, ও হেমেন্দ্র ঘোষ। এঁরা ছাড়া ঐ পাড়ায় অন্য এক ভদ্রলোকের তুই ছেলে ও তাঁর বাগানের এক মালীকে পুলিস গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় ও পরে তুদিন আটক রাখবার পর ছেড়ে দেয়।

(২) ১৩৪ নং হ্যারিসন রোডের কবিরাজ তুই ভাই—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও ধরণীনাথ গুপ্ত। অশোক নন্দী। এখান থেকে আরও তুজন ধরা পড়ে এবং দিন কয়েক পরে ছাড়া পায়।

(৩) ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেন—কানাইলাল দত্ত ও নিরাপদ (বা নির্মল রায়)।

(৪) ৮ নং গ্রে ষ্ট্রীটে শ্রী অরবিন্দ, শৈলেন বসু ও অবিনাশ ভট্টাচার্য্য।

(৫) ৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রিটে হেমচন্দ্র কানুনগো (তখন দাস ছিলেন)।

খানাতল্লাসী করে তু'একটি জায়গা ছাড়া আর কোথাও বিপ্লব সংক্রান্ত বিশেষ কিছু মালমশলা পাওয়া গেল না। কোথাও বা পাওয়া গেল তু'একখানি চিঠি পত্র। মুরারী-

পুকুরে কিছু পাওয়া গিয়েছিল, যেমন, রিভলভার, বন্দুক, রাইফেল, কতগুলো নোবেল ডিনামাইট, ইলেকট্রিক ব্যাটারী, বোমার সেল ঢালাই করবার যন্ত্রপাতি, বিস্ফোরক তৈরী করবার প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকখানি বই, বোমা তৈরীকরবার প্রণালী-সমেত একখানি লিখো পাণ্ডুলিপি, গুপ্ত সমিতি গঠন করবার নিয়মাবলী, কতগুলো বই, কাগজ পত্র, নোট বুক ইত্যাদি। কবিরাজের ঘর থেকে পূর্বোল্লিখিত মালমশলা পাওয়া গেল। তাছাড়া পুলিস প্রাপ্ত কাগজপত্র থেকে কয়েকটা নাম সংগ্রহ করেছিল। তাই দেখে পরে অনেক লোক ধরা পড়েছিলেন—শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোসাই, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, যশোহরের বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীহট্টের হেমচন্দ্র সেন, বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন, সুশীলকুমার সেন (তিন ভাই), খুলনার সুধীর সরকার, মালদহের কৃষ্ণজীবন সান্যাল, নাগপুরের বালকৃষ্ণ কাণে। তাছাড়া চন্দননগরের অধ্যাপক চারু রায়, দেবব্রত বসু, যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিজয় ভট্টাচার্য, নিখিল রায়, প্রভাসচন্দ্র, ও ইন্দ্রনাথ নন্দী, বহু নির্দোষ ব্যক্তিও ধরা পড়েছিলেন। মহাপণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

২রা মে ভোরবেলায় খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার সম্পর্কে অরবিন্দ তাঁর 'কারাকাহিনী'তে লিখছেন—'শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছিলাম, ভোর প্রায় পাঁচটার সময়

আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া, ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল। জাগিয়া উঠিলাম, পরমুহূর্তে ক্ষুদ্র ঘরটি সশস্ত্র পুলিসে ভরিয়া উঠিল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান, ২৪ পরগণার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদকুমার গুপ্তের লাবণ্যময় ও আনন্দ দায়ক মূর্তি, আর কয়েকজন ইন্সপেক্টর, লালপাগড়ী, গোয়েন্দা, খানাতল্লাসীর সাক্ষী। হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক কামানসহ একটি সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিল। শুনিলাম, একটি শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষ আমার ভগিনীর বুকের উপর পিস্তল ধরে, তাহা স্বচক্ষে দেখি নাই। বিছানায় বসিয়া আছি, তখনও অর্ধনিদ্রিত অবস্থা, ক্রেগান জিজ্ঞাসা করিলেন, অরবিন্দ ঘোষ কে—আপনিই কি? আমি বলিলাম, আমিই অরবিন্দ ঘোষ। অমনি আমাকে গ্রেপ্তার করিতে একজন পুলিসকে বলেন। তাহার পর ক্রেগানের একটি অতিশয় অভদ্র কথায় দুজনের অল্পক্ষণ বাগ-বিতণ্ডা হইল। আমি খানাতল্লাসীর ওয়ারেণ্ট চাহিলাম, পড়িয়া তাহাতে সহি করিলাম, ওয়ারেণ্টে বোমার কথা দেখিয়া বুঝিলাম, এই পুলিস সৈন্যের আবির্ভাব মজঃফরপুরের খুনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কেবল বুঝিলাম না আমার বাড়ীতে বোমা বা অন্য কোন স্ফোটক পদার্থ পাইবার আগেই body warrant-এর অভাবে কেন আমাকে গ্রেপ্তার করে। তবে সেই সম্বন্ধে বৃথা আপত্তি করিলাম না। তাহার পরেই ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি

দেওয়া হইল। একজন হিন্দুস্থানী কনেষ্টবল সে দড়ি ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল।'

মুরারীপুকুর বাগান খানাতল্লাসী সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথ লিখছেন, —'রাত্রি যখন প্রায় চারটা, তখন কতকটা গ্রীষ্মের জ্বালায়, কতকটা মশার কামড়ে শুইয়া শুইয়া ছটফট করিতেছি। এমন সময় শুনিলাম যে কতকগুলো লোক মস্‌মস্‌ করিয়া সিঁড়িতে উঠিতেছে; আর তাহার একটু পরেই দরজায় ঘা পড়িল—গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌। বারীন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই একটা অপরিচিত ইউরোপীয় কণ্ঠে প্রশ্ন হইল; —your name?...Barindra Kumar Ghose. হুকুম হইল, 'বাঁধো ইস্‌কো'।

'বুঝিলাম ভারত উদ্ধারের প্রথম পর্ব এইখানে সমাপ্ত। তবুও মানুষের যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। পুলিস প্রহরীরা ঘরে ঢুকিয়া যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই মারিতেছে, কিন্তু ঘর তখন অন্ধকার! ভাবিলাম—now or never. আর এক দরজা দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিলাম চারিদিকে আলো জ্বালিয়া পুলিস প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। রান্নাঘরের একটা ভাঙ্গা জানালা দিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়া যায়; সেখানে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম নীচে দুইজন পুলিস প্রহরী। হায়রে! অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। অগত্যা বারান্দার পাশে একটা ছোট ঘর ছিল, তাহারই মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘরটি ভাঙ্গাচুরা কাঠ কাঠরায় পরিপূর্ণ;

আরসুলা ও ইন্দুর ভিন্ন অপর কেহ সেখানে বাস করিত না। চাহিয়া দেখিলাম একটা জানালার সম্মুখে একখানা জরাজীর্ণ চটের পর্দা ঝুলিতেছে। তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জানলার ফাঁক দিয়া পুলিস প্রহরীদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সে রাতটুকু যেন আর কাটে না!

'ক্রমে কাক ডাকিল; কোকিলও এক আধটা বোধ হয় ডাকিয়াছিল। পূর্বদিক একটু পরিষ্কার হইলে দেখিলাম বাগান লাল পাগড়ীতে ভরিয়া গিয়াছে। কতকগুলো গোরা সার্জেন্ট হাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাবুক লইয়া ঘুরিতেছে। পাড়ার যে কয়জন কোচম্যান জাতীয় জীবকে খানাতল্লাসীর সাক্ষী হইবার জন্য পুলিসের কর্তারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন তাহারা 'হুজুর হুজুর' করিয়া ছুটিতেছে। পুকুর ঘাটের একটা বড় আমগাছের তলায় আমাদের হাতবাঁধা ছেলেগুলা জোড়া জোড়া বসিয়া আছে; আর উল্লাসকর তাহাদের মধ্যে বসিয়া ইন্সপেক্টর সাহেবের ওজন তিন মণ কি সাড়ে তিন মণ এই সম্বন্ধে গবেষণা-পূর্ণ বিচার আরম্ভ কয়িয়া দিয়াছে।

'ক্রমে ছয়টা বাজিল, সাতটা বাজিল; আমি তখনও পর্দানসিন বিবিটির মত পর্দার আড়ালে। ভাবিলাম এ যাত্রা বুঝি কর্তারা আমাকে ভুলিয়া যায়! কিন্তু সে বৃথা আশা বড় অধিকক্ষণ পোষণ করিতে হইল না। আমাদের অতিকায় ইন্সপেক্টর সাহেব জুতার শব্দে পাশের ঘর কাঁপাইতে কাঁপাইতে আসিয়া আমার ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। পাছে

নিশ্বাসের শব্দ হয় সেই ভয়ে আমি নাক টিপিয়া ধরিলাম। কিন্তু বলিহারী পুলিসের ঘ্রাণশক্তি! সাহেব সোজা আসিয়া আমার লজ্জানিবারণী পর্দাখানি একটানে সরাইয়া দিলেন। তারপরেই চারচক্ষের মিলন—কি স্নিগ্ধ! কি মধুর! কি প্রেমময়! সাহেব ত দিগ্বীজয়ী বীরের মত উল্লাসে এক বিরাট 'Hurrah' ধ্বনি করিয়া ফেলিলেন। সেই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চারপাঁচজন পার্ষদ সেখানে উপস্থিত হইল। কেহ ধরিল আমার পা, কেহ ধরিল আমার হাত, কেহ ধরিল মাথা। তাহার পর কাঁধে তুলিয়া হুলুধ্বনি করিতে করিতে আমাকে একেবারে হাতবাঁধা ছেলের দলের মাঝখানে বসাইয়া দিল। আমার হাত বাঁধিবার হুকুম হইল। যে পুলিস প্রহরী আমার হাত বাঁধিতে আসিল—হরি!—হরি!—সে যে আমাদের 'বন্দেমাতরম্' আফিসের ভূতপূর্ব বেহারা! কতকাল সে আমাকে বাবু বলিয়া সেলাম করিয়া চা খাওয়াইয়াছে। আজ আমার হাত বাঁধিতে আসিয়া সে বেচারীও লজ্জায় মুখ ফিরাইল।

'এদিকে খানাতল্লাসী করিতে করিতে গত রাত্রের পোঁতা রাইফেল ও বোমাগুলি বাহির হইয়া পড়িল। আর কোনও জিনিস কোথাও পোঁতা আছে কিনা জানিবার জন্য পুলিস ছেলেদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিতেছে দেখিয়া বারীন্দ্র ইন্সপেক্টর জেনারেল প্লাউডেন সাহেবের নিকট নালিশ করে। সাহেব হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দেন। বলেন—"you must

not expect too much from us."—আমাদের নিকট হইতে বড় বেশি কিছু আশা করিও না।'

প্রথমটা দলের কেউ অনুমান করতে পারে নি যে দলের সবকয়টি আস্তানা খানাতল্লাস করা হয়েছে এবং সকলেই ধরা পড়েছে। হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন—'২রা মের বিভিন্ন স্থানে ধৃত ব্যক্তিদিগকে লালবাজার পুলিস হাজতে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে পৃথকভাবে রাখা হয়েছিল। বিকেলবেলা পুলিস কোর্টের উঠোনে সকলকে বের করা হল। তখন আমরা সকলে সকলকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কারণ, প্রত্যেক দলই মনে করেছিল, কেবল তারাই ধরা পড়েছে! তখন দেখল গুপ্ত সমিতির বংশে বাতি দিতে আর বাকী প্রায় কেউ নেই। সকলের মুখ অত্যন্ত ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে গেছল। আমার বেশ মনে আছে, তখন কারও মুখে নির্ভীকতার চিহ্ন মাত্র না দেখতে পেয়ে বড়ই অশুভ লক্ষণ বলে বুঝেছিলাম।'

সকলে অবাক হয়েছিল কানাইলালের গ্রেপ্তার হওয়া শুনে, বিশেষ করে তাঁর পরিচিতেরা। অনেকেই জানতেন না যে কানাইলাল সত্যি সত্যিই যোগ দিয়াছেন বিপ্লবীদলে। কানাইলালের মা ব্রজেশ্বরী দেবী প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেন নি, পরে ভেবেছিলেন কানাইলালকে ভুল করে ধরা হয়েছে, পরে ছেড়ে দেওয়া হবে। অনেকেরই সেই ধারণা ছিল। কিন্তু কানাইলাল চেয়েছিলেন যদি তাঁর সহকারীদের শাস্তি হয়

তাহলে তাঁরও যেন শাস্তি হয়—সে শাস্তি দ্বীপান্তরই হোক আর সামান্য কারাদণ্ডই হোক।

জেলের মধ্যে তাঁদের ওপর বেশ উৎপীড়ন চলে। নানা চেষ্টায় তাঁদের ভেতরের কথা জানবার চেষ্টা করতে থাকে পুলিস। নাওয়া খাওয়ারও কষ্ট। কারও ভাগ্যে একটু মুড়ি, কারও ভাগ্যে একটু খিচুড়ি। অধিকাংশ সময়েই অনাহার। যে ঘরে থাকা সে ঘরেই একপাশে একটি গামলায় শৌচ ব্যবস্থা। সে অবস্থা কল্পনাতীত।

প্রথম প্রথম সকলকে আলাদা আলাদা রাখা হত। পরে একত্র রাখার ব্যবস্থা হল। একত্র থাকায় অত দুঃখের দিনে সকলে মহা আনন্দে দিন কাটাতেন। খাওয়া দাওয়া, হৈ-হুল্লোড়, তর্ক-বিতর্ক—সারাদিন গুলজার। হেমচন্দ্র ছিলেন সবার প্রিয় হেমদা। ইনি ভাল রাঁধতে পারতেন। নাচ-গানেরও অভাব ছিল না। হেমচন্দ্র, দেবব্রত ও উল্লাসকর ভাল গাইতে পারতেন। শচীন সেন গাইতে না পারলেও রাত বারোটা পর্যন্ত তার সঙ্গীত সাধনা সকলকে অস্থির করে তুলত। তাছাড়া বাগানের আম কাঁটাল চুরি করা ছিল তাঁর এক খেলা। রবিবারের আসর আরও জমে উঠত। কারণ সেদিন অনেকেরই আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব দেখা করতে আসতেন, কাজেই নানারকম খবর আসত আর সেই সঙ্গে মিষ্টান্ন। তখনকার দিনে এই দিক থেকে জেলের নিয়মের বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না।

তাঁদের অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে উপেন্দ্রনাথ লিখছেন—'অরবিন্দবাবু, দেবব্রত ও বারীন্দ্র ভিন্ন আর সকলেই এই হট্টগোল যোগ দিত; তবে মধ্যে মধ্যে যে ইঁহারাও বাধ পড়িতেন তাহা নহে। ধরা পড়িবার পর বারীন্দ্রের মনে কোথায় একটা বিষম ধাক্কা লাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, সে প্রায় সমস্তদিন একখানা চাদর মুড়ি দিয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকিত। দেবব্রত সকালে উঠিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া সেই যে অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিত, বেলা দশটা পর্যন্ত তাহাকে আর নাড়িবার উপায় ছিল না। আহারাদির পর আবার বেলা চার পাঁচটা পর্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; কখনও বা গীতা ও ভাগবত পড়িত। তাহার সময় এইরূপেই কাটিয়া যাইত। অরবিন্দ বাবুর জন্য একটা কোণ নির্দিষ্ট ছিল। সমস্ত প্রাতঃকাল তিনি সেইখানে আপনার সাধন ভজনের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। ছেলেরা চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিলেও কোন কথাই কহিতেন না। অপরাহ্নে দুই তিন ঘণ্টা পায়চারী করিতে করিতে উপনিষদ বা অন্য কোন ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন। তবে সন্ধ্যাবেলায় এক আধ ঘণ্টার জন্য ছেলে খেলায় যোগ না দিলে তাঁহার নিষ্কৃতি ছিল না।

'কানাইলাল প্রভৃতি চার পাঁচ জন নিদ্রার কাজটা সন্ধ্যার পরেই সারিয়া লইত। রাত ১০টা ১১টার সময় সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িত তখন তাহারা বিছানা ছাড়িয়া কাহার কোথায়

সন্দেশ, আম বা বিস্কুট লুকানো আছে তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিত। যে দিন সে সব কিছু মিলিত না, সে দিন এক গাছা দড়ি দিয়া কাহারও হাতের সহিত অপরেব কাছা বা কাহারও কানের সহিত অপরের পা বাঁধিয়া দিয়া ক্ষুণ্ণমনে শুইয়া পড়িত। একদিন রাত্রে প্রায় ১টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি কানাই একজনের বিছানার চাদরের তলা হইতে একটা বিস্কুটের টিন চুরি করিয়া মহানন্দে বগল বাজাইতেছে। অরবিন্দবাবু পাশেই শুইয়াছিলেন। আনন্দের সশব্দ অভিব্যক্তিতে তাঁহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কানাই অমনি খানকয়েক বিস্কুট লইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বিস্কুট লইয়া অরবিন্দবাবু চাদরের মধ্যে মুখ লুকাইলেন ; নিদ্রাভঙ্গের আর কোন লক্ষণই দেখা গেল না। চুরিও ধরা পড়িল না।'

এই সময় হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল। বারীন্দ্র পুলিসের কাছে নিজেদের কার্যকলাপ সব স্বীকার করলেন এবং তার পূর্ণ বিবরণ পুলিসের কাছে পেশ করলেন। বারীন্দ্র বললেন, My mission is over—আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে। কিভাবে যে তাঁর কাজ ফুরালো তা অনেকেই বুঝতে পারেন নি, কিন্তু বারীন্দ্র এ কথাটা জোর দিয়েই বলেছিলেন যে তাঁর কাজ ফুরিয়েছে। তাঁর দ্বারা আর দেশোদ্ধার হবে না। বারীন্দ্রের পরামর্শ অনুসারে, উপেন্দ্র, ও উল্লাসকরও তাঁদের অপরাধ স্বীকার করলেন। হেমচন্দ্র কানুনগোকেও বারীন্দ্র চেষ্টা করেছিলেন স্বীকারোক্তি করাতে। কিন্তু হেমচন্দ্র ছিলেন এর

ঘোরতর বিপক্ষে। তিনি স্পষ্টই বারীন্দ্রের এই নীতির নিন্দা করেছেন। তিনি অনেক চেষ্টা করেও বারীন্দ্রকে নিরস্ত করতে পারেন নি। হেমচন্দ্র অরবিন্দের নাম নিয়েও বলেছেন, বারীন্দ্রকে নিরস্ত হতে, কিন্তু বারীন্দ্র স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, অরবিন্দ এসব কি বোঝে ? কিন্তু এত বড় বিপ্লবী হয়ে বারীন্দ্র কেন যে আত্মসমর্পণ করলেন তার পশ্চাতে এই সকল যুক্তি আছে। বারীন্দ্র নিজে লিখেছেন—(১) 'আমাদের দফা ত এইখানেই রফা হইল, এখন আমরা যে কি করিতেছিলাম তাহা দেশের লোককে বলিয়া যাওয়া দরকার।'

(২) অন্যত্র বারীন্দ্র লিখেছেন, 'এই প্রকারে আত্মকীর্তি রাখিতে গিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছি। ইহার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বাহাদুরীর বেশ গাঢ় প্রলেপ আছে।'

(৩) 'আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে ঘাতকহস্তে স্বেচ্ছায় যাচিয়া জীবন দিতে না দেখিলে, বুঝি এ মরণ-ভীরু জাতি মরিতে শিখিবে না।"

দেখা যাচ্ছে দেশের সামনে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বারীন্দ্র সকল কথা স্বীকার করলেন। বারীন্দ্রের মতে তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে—mission is over. বারীন্দ্র ঠিক কাজ করেছিলেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে এটা ঠিক যে বারীন্দ্র গুপ্ত সমিতির রীতিবিরুদ্ধ কাজ করেছেন। মারাত্মক কুফল ফলে নরেন গোসাইর নাম করার ফলে। প্রথমে পুলিস নরেন গোসাইঁকে জানত না।

পরে বারীন্দ্রের কাছে তার নাম জেনে তাকে গ্রেপ্তার করে। বারীন্দ্র দেশের সামনে উচ্চ আদর্শ স্থাপনের জন্য, হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করবার জন্য নিজের ইচ্ছামত সাজিয়ে-গুজিয়ে, কমিয়ে-বাড়িয়ে সব কথা বলেছেন আর নরেন গোসাই ফাঁসির ভয়ে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে রাজ-সাক্ষী হয়ে সব কথা হুবহু বলে দিয়েছে পুলিসের কাছে। ফলে পুলিসের অনকে সুবিধে হয়ে গেল। দলের সর্বনাশ হল। এখানেই বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি ও নরেনের স্বীকারোক্তির পার্থক্য।

১৯শে মে মিঃ বার্লির কোর্টে ওঁদের বিচার আরম্ভ হল। এই বিচার ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছিল। বিচার দু'চারদিন চলবার পরই নরেন গোসাই সরকারী সাক্ষী (approver) হয়ে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। হেমচন্দ্র লিখছেন, 'আমাদের গ্রেপ্তারের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে একদিন শোনা গেল, নরেন গোসাইর সঙ্গে প্রতিদিন তিন চার ঘণ্টা করে সপার্ষদ পুলিস সাহেবের আর নরেনের বাবার, দরজা বন্ধ করে গোপনে কি পরামর্শ চলছে। তখন আর আমাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, নরেন আমাদের বিরুদ্ধে রাজার সাক্ষী অর্থাৎ approver হতে যাচ্ছে। আমাদের যত রাগ, দ্বেষ, ঘৃণা, সবই গিয়ে পড়ল নরেন, তার বড়লোক বাবা আর গুরু গোসাইদের ওপর।'

প্রথমদিকে পুলিস নরেনকে আলাদা রাখবার ব্যবস্থা করেছিল। তারপর কিছুদিন ওদের সকলের সঙ্গে রেখেছিল যদি গল্পের ভেতর দিয়ে নরেন আরও কিছু জানতে পারে।

কারণ, পুলিস তখনও বুঝতে পারে নি ওরা নরেনকে সন্দেহ করেছে। কিন্তু সন্দেহ সকলেই করেছিল এবং হেমচন্দ্র লিখছেন, 'নরেনকে কেউ মেরে ফেলুক, অরবিন্দ বাবু, দেবব্রতবাবু প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া প্রায় অধিকাংশের মনে এই ইচ্ছা জেগেছিল। তখন বাংলাদেশে যে ক'টি বৈপ্লবিক গুপ্তদল ছিল, বারীনের প্রস্তাব অনুযায়ী তার প্রায় সকল দলের ওপর নরেনের হত্যার ভার দেওয়া হল।

'...আমাদের মধ্যে দু'এক জন বালক, বিশেষ করে সুশীল নিদ্রিতাবস্থায় তার গলাটিপে কিংবা যে ইট দিয়ে আমাদের অস্থায়ী পায়খানা তৈরী হয়েছিল তার একখানা তার মাথায় ঠুকে মেরে ফেলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। নির্দোষ অরবিন্দবাবুকে তাতে জড়িয়ে ফেলবার ভয়ে বারীন আদি বয়োবৃদ্ধেরা তাতে অসম্মতি জানান।...বালক কৃষ্ণজীবন কি নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে তাকে লাথিও মেরেছিল। এর দু'এক দিন পরেই হাঁসপাতালের কাছে দু'জন য়ুরেশিয়ান কয়েদীকে নরেনের শরীর রক্ষক নিযুক্ত করে তাকে পৃথক ভাবে আরামে রাখা হয়েছিল।'

শোনা যায় কানাইলালের মা ব্রজেশ্বরী দেবীও নাকি এমন কথা বলেছিলেন যে, দেশে এমন কোন ছেলে কি নেই যে এই পাষণ্ডকে শেষ করে দেয়!

ইতিমধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট মোকর্দমা সেসনে পাঠিয়ে দিলেন। উপেন্দ্রনাথ লিখছেন, 'ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের মোকর্দমা সেসনে

পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। আমরাও লম্বা ছুটি পাইলাম। নিষ্কর্মার দল—কাজেই সকলেই হাসে, খেলে, লাফালাফি করে আর মোকর্দমার ফল লইয়া মাঝে মাঝে বিচার-বিতর্কও করে। ছেলেরা কাহাকেও বা ফাঁসিকাঠে চড়ায়, কাহাকেও বা খালাস দেয়। কানাইলাল একদিন বলিল, 'খালাসের কথা ভুলে যাও, সব বিশ বছর করে কালাপানি।' শচীনের তাহাতে ঘোরতর আপত্তি। সে প্রমাণ করিতে বসিল যে, বিশ বৎসরের মধ্যে দেশ স্বাধীন হইবেই হইবে। কানাইলাল খানিকক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, 'দেশ মুক্ত হোক আর হোক, আমি হবো। বিশ বৎসর জেলখাটা আমার পোষাবে না।' এই কথার দুই একদিন পরেই একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ পেটে হাত দিয়া শুইয়া পড়িয়া সে বলিল যে তাহার পেটে যন্ত্রণা হইতেছে। ডাক্তার বাবু আসিয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি সে হাসপাতালে রহিয়া গেল। মেদিনীপুরের সত্যেনকে কিছুদিন পূর্বে পুলিস ধরিয়া আনিয়াছিল। কঠিন কাশরোগগ্রস্ত বলিয়া সেও হাসপাতালে থাকিত।'

নরেন গোঁসাইকে হত্যা

নরেন গোসাই কেন যে হঠাৎ এই কুকাজ করে বসল ঠিক বোঝা যায় না। হেমচন্দ্র লিখছেন—'বাংলার বৈপ্লবিক ব্যাপারে নরেন যে প্রথম Approver সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার Approver হওয়ার পক্ষে যে সকল inducement ছিল, তার পরে যারা Approver বা Informer হয়েছে, তাদেব সে রকম বিশেষ কিছুই ছিল না। নরেন দণ্ড হতে অব্যাহতির রাজকীয় প্রতিশ্রুতি ত পেয়েই ছিল, অধিকন্তু বিলাতে সপরিবারে রাজার হালে থাকবার আশাও নাকি পেয়েছিল। সে বলত, বারীন তাকে এবং অন্য অনেককে ঈর্ষা বশতঃ ধরিয়ে দিয়েছে, তার প্রতিশোধ দিতেই সে Approver হয়েছে। Approver হওয়ার এ একটা ছুঁতো সে পেয়েছিল। পরবর্তী Approver দের এত সব সুযোগ ছিল না। এখনও নেই। উপরন্তু তাদের সামনে নরেনের ভীষণ দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবু, Approver, Informer, Agent, Provocateur আদির এত ভীড় দেখে কখনও কখনও মনে হয় দুটি অমূল্য রত্ন—সত্যেন ও কানাই—বৃথা ওরকম ভীষণ নরহত্যা করে অকারণে আত্মবিসর্জন দিয়েছিল।'

আবার নরেন গোসা সম্পর্কেই অরবিন্দ লিখছেন—'গোঁসাই অতিশয় সুপুরুষ, লম্বা, ফরসা, বলিষ্ঠ, পুষ্টকায়, কিন্তু তাহার চোখের ভাব কুবৃত্তি-প্রকাশক ছিল, কথায়ও বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ পাই নাই। এ বিষয়ে অন্য যুবকদের সঙ্গে তাহার বিশেষ প্রভেদ ছিল ; তাঁহাদের মুখে প্রায়ই উচ্চ ও পবিত্র ভাব অধিক এবং কথায় প্রখর বুদ্ধি, জ্ঞানলিপ্সা ও মহৎ স্বার্থহীন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইত। গোঁসায়ের কথা নির্বোধ ও লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল।···এইরূপ লোকই Approver হয়।'

নরেন গোসাইঁর হত্যাবিবরণ লেখবার আগে আর একটা কথা বলা দরকার। ইতিমধ্যে জেলে থাকতে থাকতে বারীন্দ্র জেল ভেঙ্গে পালাবার এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করেন। তার জন্য ১৫।২০টা রিভলভার যোগাড় করবার চেষ্টা হচ্ছিল এবং অনেকে পালাতে গেলে দৌড়তে হবে জেনে কারা প্রাচীরের মধ্যেই দৌড় অভ্যাস সুরু করে দিলে। তখনকার দিনে জেলের মধ্যে রিভলভার আনার খুব বেশি অসুবিধে ছিল না। এখনকার দিনের মত নিয়মকানুনের কড়াকড়ি তখন অত হয় নি। যাই হোক একটা সেকেলে মরচে-ধরা বড় রিভলভার যোগাড় হয়ে গেল। হেমচন্দ্র স্পষ্টই লিখছেন—'সত্যেন এই সকল বন্দোবস্তের কথা শুনে জেলের মধ্যে আমাদের কাছে প্রথম রিভলভারটা এলেই তা চুরি ক'রে অন্য কাউকে কিছু না জানিয়ে, নিজেই নরেনকে মারবে বলে

স্থির করে ফেললে। কারণ, সে জানত, আমাদের কর্তারা টের পেলে নিশ্চয় বাধা দেবেন।'

কাশরোগী সত্যেন্দ্র হাঁসপাতালে থাকতেন এ কথা আগেই বলেছি। কিছুদিন ধরে সত্যেন্দ্র এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যে তিনিও নরেন গোসাইর মত রাজসাক্ষী হবেন। ফলে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে নরেন গোঁসাইর যোগাযোগ খুবই বেড়ে গেল। নরেন গোসাই প্রায় রোজই হাঁসপাতালে এসে দেখা করত সত্যেন্দ্রের সঙ্গে। রোজ রোজ পুলিসের কাছে এজাহার দিতে অসুবিধে হয় বলে সত্যেন্দ্র সমস্ত এজাহার লিখে একসঙ্গে দাখিল করতে চেয়েছিলেন পুলিসের কাছে। পুলিস রাজী হয়েছিল। যাতে এজাহার গোলমাল না হয় তার জন্য নরেন গোসাঁই রোজ এসে সত্যেন্দ্রকে সামনে বসে লেখাত। সত্যেন্দ্র লিখতেন, যে দিন কোর্ট থাকত সেদিন সকালে আর অন্য দিন বিকেলে লেখা চলত।

দেবব্রতবাবু যতীন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ প্রমুখ আটজনের মোকর্দমা তখনও বালির কোর্টে চলছিল। ১লা সেপ্টেম্বর তাঁদের সম্বন্ধে বলবার কথা। সত্যেন্দ্র জানতেন এই দিন নরেন গোসাঁই অনেক নতুন কথা বলবে, অনেক নতুন নামের উল্লেখ করবে। প্রায় বিশজন নতুন লোকের ধরা পড়বার সম্ভাবনা ছিল। কাজেই সত্যেন্দ্র ঠিক করলেন ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার সকালেই গোসাঁইকে শেষ করতে হবে। আগের দিন বিকেল ৫ টার সময় সত্যেন্দ্র তাঁর পুরণো রিভলভারটা আর একজন বন্দীর

(হেমচন্দ্র কানুনগো ?) কাছ থেকে বদলে তাঁর ভাল রিভল-ভারটা নিয়ে আসলেন। সত্যেন্দ্র নিজ হাতে এই বদলাবদলির কাজ করেন নি। মধ্যস্থতা করলেন কানাইলাল। হেমচন্দ্র এমনভাবে নেকড়া জড়িয়ে পাঠিয়েছিলেন যে কানাইলাল বুঝতে পারেন নি, কিন্তু সত্যেন্দ্রর কাছ থেকে বড় রিভলভারটা পেয়ে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারেন এবং সত্যেন্দ্রর সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান। ঠিক হয়, আগে সত্যেন্দ্র মারবেন, তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হলে কানাইলাল মারবেন। কানাইলাল স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করতে আসায় ভালই হয়েছিল। তা নাহলে নরেন গোসাই অব্যাহতি পেয়ে যেত সে যাত্রায়।

পরের দিন আসল ব্যাপারটা যা ঘটেছিল সেই সম্বন্ধে হেমচন্দ্র বিশদভাবে লিখেছেন—'পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে নরেন অন্য দিনের মত তার শরীররক্ষক দুজন য়ুরেশিয়ান কয়েদী ওয়ার্ডার সঙ্গে করে হাঁসপাতালের দোতলার ওপর সিঁড়ির পাশে ডিসপেনসারিতে গিয়ে সত্যেনের সামনে বসেছিল। রিভলভারটা সহজে কেউ কেড়ে নিতে না পারে, সে জন্য না কি সত্যেনের কোমরে দড়ি দিয়ে সেটা বাঁধা ছিল। সত্যেন জামার ভেতর থেকেই না কি নরেনকে তাক করে মারে। খট্ করে শব্দ হল, কিন্তু কার্তুস আগুন দিলে না। সত্যেন পরমুহূর্তে জামার ভেতর থেকে রিভলবার বের করে আবার নরেনকে তাক করে। তখন হিগেন বোথাম নামক পূর্বোক্ত একজন য়ুরেশিয়ান কয়েদী ওয়ার্ডার রিভলবারটা

ধরে টানাটানি করাতে আওয়াজ হয়ে তার হাতের কব্জি ভেঙ্গে যায়, কাযেই রিভলবার ছেড়ে দেয়। ইত্যবসরে গোসাঁই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেই কানাই গুলী চালায়। কানাই দাঁত মাজার ভান করে ডিসপেনসারির পাশে সিঁড়ির সামনে পায়-চারী করছিল। যাই হোক, গুলী সামান্য ভাবে পায়ের কোন স্থানে লেগেছিল। তাই সিঁড়ি নেবে হাঁসপাতালের ফটক পার হয়ে—দুপাশে দেয়াল, এমন একটা লম্বা সরু গলির ভেতর গিয়ে পড়েছিল। কানাইও পেছনে তাড়া করেছিল।

'সত্যেন ডিসপেনসারি থেকে বেরিয়ে সামনে একজন কয়েদীকে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল নরেন কোথায় গেল! আঙ্গুল দিয়ে ইসারায় সে দেখিয়ে দিলে সত্যেন ছুটে গিয়ে কানাইর সঙ্গে যোগ দেয়। দুজনেই গুলী চালাতে থাকে। সত্যেনের একটা গুলীতে কানাইর গায়ের চামড়া ছোলা হয়ে গেছল; এ থেকে বোঝা যায় সত্যেন যখন সেখানে যায়, তখনও নরেন জমী ধরে নি। নরেন নাকি দু'একবার পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে খুব বলিষ্ঠ জোয়ান ছিল।

'তারপর যথারীতি পাগলা ঘণ্টি, ভোম্বা, কর্মচারীদের হুটোপুটি, দৌড়াদৌড়ি, সত্যেন ও কানাইকে গ্রেপ্তার, সব ওয়ার্ডে তালা বন্ধ, খানাতল্লাসী ইত্যাদি যথারীতি সবই হয়েছিল।

উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন,—'সকালবেলা বিছানা হইতে উঠিয়া আমরা মুখ-হাত ধুইতেছি, এমন সময় হাসপাতালের দিক

হইতে দুই একটা বন্দুকের মত আওয়াজ শুনিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম চারিদিক হইতে কয়েদী পাহারাওয়ালারা হাসপাতালের দিকে ছুটিতেছে। ব্যাপার কি? কেহ বলিল বাহির হইতে হাসপাতালের উপর গোলা পড়িতেছে, কেহ বলিল সিপাহিরা গুলি চালাইতেছে। হাসপাতালের একজন কম্পাউণ্ডার ঘুরপাক খাইতে খাইতে ছুটিয়া আসিয়া জেলের অফিসের কাছে শুইয়া পড়িল। ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে সংবাদ দিবার জন্য সে ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহা তাহার পেটের মধ্যেই রহিয়া গেল! প্রায় দশ পনের মিনিট এইরূপ উৎকণ্ঠায় কাটিল, শেষে একটা পুরানো চোর ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল—'নরেন গোঁসাই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!" "ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কিরে?" "আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু; কানাইবাবু তাকে পিস্তল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। ঐ দেখুন গে না—কারখানার সুমুখে সে একদম লম্বা হয়ে পড়েছে। আর জেলার বাবুরও আর একটু হলে হয়ে যেত। তিনি কারখানায় ঢুকে পড়ে বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে খুব প্রাণটা বাঁচিয়েছেন।"

'প্রায় পনের মিনিট পরে জেলের পাগলা ঘণ্টা (alarm bell) বাজিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে জেলের প্রহরীরা ছুটিয়া আসিয়া হাসপাতালের দিকে চলিল। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম তাহারা কানাই ও সত্যেনকে ধরিয়া ৪৪ ডিগ্রীর দিকে লইয়া চলিয়াছে।'

নরেনকে হত্যা-ব্যাপারটা উপেন্দ্রনাথ আরও একটু বিশদ ভাবে লিখেছেন, বিশেষতঃ শেষের দিকটা ; তিনি লিখেছেন—'...গুলীর শব্দ শুনিবামাত্র কানাইলাল হাসপাতালের নীচে হইতে উপরে ছুটিয়া আসে। ইউরোপীয় প্রহরী তাহাকে ধরিতে যায়, কিন্তু হাতে একটা গুলি খাইয়া সে সেইখানেই পড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে। ইতিমধ্যে নরেন নীচে আসিয়া হাসপাতালের বাহির হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় প্রহরীকে ধরাশায়ী করিয়া কানাই যখন নরেনকে খুঁজিতে থাকে তখন সে হাসপাতালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং হাসপাতালের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একজন প্রহরী সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। কানাই তাহার বুকের কাছে পিস্তল ধরিয়া ভয় দেখায় যে নরেন কোথায় পলাইয়াছে তাহা যদি সে বলিয়া না দেয় ত তাহাকে গুলি খাইয়া মরিতে হইবে। বেচারা দরজা খুলিয়া দিয়া বলে যে নরেন অফিসের দিকে গিয়াছে। কানাই ছুটিয়া আসিতে আসিতে দূর হইতে নরেনকে দেখিতে পায় ও গুলি চালাইতে থাকে। গুলির শব্দ শুনিয়া জেলার, ডেপুটি জেলার, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট জেলার, বড় জমাদার, ছোট জমাদার, সবাই সদলবলে হাসপাতালেব দিকে আসিতেছিলেন। পথের মাঝে কানাই-এর রুদ্রমূর্তি দেখিয়া তাঁহারা রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। কে যে কোথায় পলাইলেন, তাহার ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না ; তবে জেলার বাবু যে তাঁর বিপুল কলেবরের অর্ধেকটা কারখানার একটা বেঞ্চের

নীচে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন একথা সর্ববাদী সম্মত। এদিকে কানাইএর হাত হইতে গুলি খাইতে খাইতে নরেন কারখানার দরজার কাছে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। কানাইয়ের গুলি যখন ফুরাইয়া গেল তখন বন্দুক কীরিচ, লাঠি সোটা লইয়া সকলেই বাহির হইয়া আসিল এবং কানাইকে ঘিরিয়া ফেলিল।'

বারীন্দ্র লিখেছেন—'এদিকে সত্যেন পকেটে হাত রাখিয়া কথা কহিতে কহিতে পকেটেই পিস্তল সই করিয়া নরেনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। গুলি নরেনের উরুতে লাগিয়া মাংস ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। য়ুরেশিয়ান কয়েদী সত্যেনকে ধরিতে গিয়া পিস্তলের বাঁটের ঘায়ে আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া পিছাইয়া পড়িল। নরেন্দ্র ছিল কুস্তিগীর, বেশ সাজোয়ান পুরুষ, গুলি খাইয়া সে হাঁসপাতাল ছাড়িয়া বাহির হইয়া দৌড় দিল। খোলসা পথ পাইয়া কানাই তাড়া করিতে করিতে নরেনের পিঠ লক্ষ্য করিয়া, গুলি করিল, গুলি শির-দাঁড়া ভেদ করিয়া বুকে বসিয়া গেল। ফলে নরেন তখনই মরিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।'

নরেন গোসাইকে মারার ব্যাপারে যতরকম বিবরণ পাওয়া যায় তার উল্লেখ করা গেল। তিনটি বিবরণীর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তবে এর মধ্য থেকে ব্যাপারটা বেশ খানিকটা আন্দাজ করে নিতে পারা যাবে।

হেমচন্দ্র লিখেছেন—বারীন্দ্র জেল ভেঙ্গে পালাবার ফন্দি করছিলেন, তার ফলেই জেলের মধ্যে রিভলভার পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। প্রচলিত কথা এই যে, এক কাঁঠালের মধ্যে রিভলভার পুরে বাইরে থেকে কেউ পাঠিয়ে দিয়েছিল। আর কানাইলালকে প্রশ্ন করতে, তিনি, জবাব দিয়েছিলেন, ক্ষুদিরামের ভূত পিস্তল দিয়ে গেছে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে কানাইলাল ইচ্ছা করেই ব্যাপারটা গোপন রেখেছেন। যদিও বিচারের সময় কানাইলাল অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু অপরাধ অস্বীকার করেন। রিভলভার পাওয়া সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেন নি। তবে উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'তবে কর্তৃপক্ষের চক্ষুর অগোচরে জেলের মধ্যে গাঁজা, গুলি, আফিম, সিগারেট সবই যে রাস্তা দিয়া যাইতে পারে, সে রাস্তা দিয়া পিস্তল যাওয়া ত বিচিত্র নয়!'

হত্যাকাণ্ড হয়ে যাবার পর সকলের ঘর এমন কি সমস্ত ব্যারাক তল্লাস করা হল। উপেন্দ্রনাথ বেশ সরসভাবে তার বর্ণনা দিচ্ছেন—'বিছানার মধ্যে বা এদিক ওদিক দশ বিশটা টাকা লুকান ছিল। তল্লাসীর সময় প্রহরীরা তাহা নির্বিবাদে হজম করিয়া লইল।...আরও রিভলভার জেলের মধ্যে লুকান আছে কি না, পুকুরের মধ্যে দুই একটা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে কি না ইত্যাদি বহুবিধ গবেষণা চলিতে লাগিল। আমাদের বড় আশা হইয়াছিল যে, রিভলভার অনুসন্ধান করিবার জন্য যদি জেলখানার পুকুরের জল ছেঁচিয়া ফেলে,

তাহা হইলে এক আধদিন যথেষ্ট পরিমাণে মাছ খাইতে পাওয়া যাইবে ; কিন্তু অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না।

'সন্ধ্যার সময় জেলারবাবু আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ভদ্রলোকের মুখ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন,—'মশায় এতই যদি আপনাদের মনে ছিল, ত জেলের বাইরে কাজটা করলেই ত হত। দেখছি ত' আপনারা একেবারে মরিয়া ; তবে ধরা পড়তে গেলেন কেন ?...'

শহীদ কানাই

যথারীতি বিচার হল কানাই ও সত্যেন্দ্রর। দুজনেরই ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। কানাইর ফাঁসি হল আগে—১০ই নভেম্বর আর সত্যেন্দ্রর পরে—২৩শে নভেম্বর। কানাইলাল আপীল করতে রাজী হন নি তাই তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল আগে আর সত্যেন্দ্র অনেক পীড়াপীড়ি করবার পর আপীল করেছিলেন তাই তাঁর ফাঁসি হতে কিছু দেরী হল। আপীলের জবাবে ভারতের শাসনতন্ত্র রচয়িতা লর্ড মিণ্টো তারযোগে জানিয়েছিলেন—আপীলের জন্য ফাঁসি স্থগিত থাকতে পারে না।

কানাইলাল বিপ্লবীদের সম্পর্কে একদা সমালোচনা করে বলেছিলেন, যে তাদের মনে আত্মরক্ষার দুর্বলতা ও বিশ্বাসের

ওপর নিষ্ঠার অভাব থাকায় তারা সফলকাম হয় না। তাঁর মুখের কথা তিনি জীবনে হাতে কলমে প্রমাণ করে দিলেন। সকল্পের জোর থাকলে সবই সম্ভব তা তিনি সকলের চোখের সামনে সম্ভব করে দেখালেন। কানাইলাল বলেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে আপাততঃ কোন চার্জ না থাকলেও তাঁর সঙ্গীদের যে দশা হবে তিনি নিজেও তাই বরণ করে নেবেন। দলের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের ফাঁসির দণ্ড হয়েছিল—কানাইলাল হলেন সবার পথপ্রদর্শক। কানাইলাল তাঁর প্রিয় বন্ধু মতিলাল রায়ের সঙ্গে জেলের মধ্যে কথাবার্তা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'মনে কোর না জেলে পচবার জন্যে এই কাজে নেমেছি, আন্দামানে বা ফাঁসিকাঠে নিরীহ মেষের মত প্রাণ দিতে জন্মেছি।' সত্যনিষ্ঠ কানাইলালের মুখের কথা মিথ্যা হবার নয়। তিনি বাকসিদ্ধ।

কানাইলালের অগ্রজ আশুতোষবাবু ফাঁসির হুকুম হবার পর জেলের মধ্যে যখন দেখা করতে গিয়েছিলেন,—আপীলের জন্য আবেদন করতে একবার অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন তখন কানাইলাল তাঁর সঙ্গে এমনভাবে কথা বললেন যেন ফাঁসি হয়ে গেলে তাঁর কর্তব্য শেষ করে তিনি ছুটি পাবেন। দুজন ইউরোপীয় ওয়ার্ডার আশুবাবুকে বললে, He is a wonderful chap, he is always bright. আশুবাবু একবার কানাইলালের হাত দুটো স্পর্শ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ওয়ার্ডাররা প্রথমে রাজী হয় নি। পরে তারা

বললে, তারা অন্যদিকে মুখ ঘোরাচ্ছে ইত্যবসরে তিনি যেন কাজ সেরে নেন।

হাসিমুখে অতি নির্ভীকভাবে, পরম নির্বিকার চিত্তে কানাইলাল ফাঁসির মঞ্চে আত্মবিসর্জন দিলেন। এই সম্পর্কে বারীন্দ্র ও উপেন্দ্র যা লিখেছেন তা পর পর উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

বারীন্দ্র লিখেছেন—'কানাইকে বিচার করিয়া সেসন্স সোপর্দ করার পর ওজনে সে অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল। মরিবার প্রাতে চারটার সময় তাহাকে বধমঞ্চে লইতে আসিলে সকলে দেখিল সে অকাতরে ঘুমাইতেছে। একটি ঘুম হইতে তার জাগরণ, আর একটি দীর্ঘতর নিবিড়তর ঘুমের জন্যে। তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় উঠানে বেড়াইতে বাহির হইয়া সে আমার ও অনেকের কুঠরির সামনে দাঁড়াইয়া স্মিতহাস্যে বিদায় নমস্কার করিয়াছিল। সেদিন প্রহরী বাধা দেয় নাই, পরন্তু আমাদের উঠানের দরজা মুক্ত রাখিয়াছিল। সে সহাস্য প্রসন্ন জ্যোতির্ময় রূপ আমি কখনও ভুলিব না। কানাই তখন মহাতাপস, প্রকৃত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। পথ ভুল হউক, আর সত্য হউক, তাহার মরণের সে মহত্ব যাইবার নয়···যে কোন দেশে কানাইয়ের তুলনা নাই। কারণ, এ বীরপূজার জাতি নাই,

গোত্র নাই, দেশ নাই ও যেখানে মানুষ প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইয়া আর্ত-তারণ ব্রত ধরে, সেইখানে তখনি সে নমস্য।'

উপেন্দ্রের অভিমত—'জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াছি ; কানাই-এর মত এমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটা দেখি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিপদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনিই ফুটিয়া রহিয়াছে।...প্রহরীর নিকট শুনিলাম ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর ওজন তাহার ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে! ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের এমন পথও আছে যাহা পতঞ্জলিও বাহির করিয়া যান নাই।

'তাহার পর একদিন কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ইংরাজ-শাসিত ভারতে তাহার স্থান হইল না। না হইবার কথা! কিন্তু ফাঁসির সময় তাহার নির্ভীক, প্রশান্ত ও হাস্যময় মূর্তি দেখিয়া জেলের কর্তৃপক্ষেরা বেশ একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী চুপি চুপি আসিয়া বারীনকে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমাদের হাতে এ রকম ছেলে আর কতগুলি আছে?' যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটের শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই।'

বন্ধু মতিলাল, অগ্রজ আশুতোষ ও কয়েকজন আত্মীয় শবদেহ নিতে এসেছিলেন। একজন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী তাঁদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ইঙ্গিতে একটা ঘর দেখিয়ে দিলে। ছোট একখানা ঘর, তারই একপাশে কালো কম্বলে ঢাকা কানাইলালের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সেই বীরদেহ বুকে ধরে তাঁরা বাইরে নিয়ে এলেন। কম্বল খুলতে সাহস হল না। সবার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেছে। হঠাৎ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীটি বলে উঠল, আপনারা কাঁদছেন কেন? এরকম বীর যে দেশে জন্মেছে, সে দেশ ধন্য। জন্মালে ত মরতেই হয়, এমন মরা কয়জন মরতে পারে? ওঁরা সকলে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলেন সেই বিদেশীর চোখেও জলধারা বাধা মানে নি। সে আবার বললে, আমি একজন কারারক্ষী। কানাইলালের সঙ্গে আমার অনেক কথা হত। ফাঁসির হুকুম হওয়ার পর ওর প্রফুল্লতা খুব বেড়ে গিয়েছিল। কাল সন্ধ্যায় ওর মুখে এমন মিষ্টি হাসি দেখেছি যা আমি জীবনে ভুলব না। আমি বরং বলেছিলুম, কানাই আজ হাসছ, কাল কিন্তু মরণের ছায়া তোমার হাসিভরা ঠোঁট ম্লান করে দেবে। আমার দুর্ভাগ্য যে কানাইর মৃত্যুর সময়েও আমাকে থাকতে হয়েছিল। চোখ ঢাকা দিয়ে সে যখন ধাপে ধাপে মঞ্চে উঠে গলায় ফাঁস লাগাতে যাচ্ছে ঠিক তখন আমার দিকে ফিরে আমার সাড়া নিলে। তারপর আগের মত হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলে, মিষ্টার আমায় তুমি কেমন দেখছ? এমন বীরত্ব রক্তমাংসের শরীরে সম্ভব হয় না।

সাহেবের কথা ওঁরা মুগ্ধচিত্তে শুনছিলেন ; এমন সময় পুলিস কমিশনার হ্যালিডে ও কয়েকজন পার্ষদ এসে তাঁদের তাড়া দিয়ে বাইরে যেতে বললেন। আবরণ মুক্ত করে ফেলা হল। দেখা গেল দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত কানাইলালের মৃতদেহ—মৃত্যুর করাল স্পর্শের এতটুকু ছায়া নেই সেখানে।

হ্যালিডে সাহেব বললেন, মৃতদেহ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তাই করা হল। জেল প্রহরী পায়খানায় যাবার সরু নোংরা রাস্তা দিয়ে তাঁদের বাইরে নিয়ে এল। জেলগেট পেরিয়ে আসতেই সমবেত জনতার মধ্য থেকে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিল। তারপর শবদেহ বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরণীর মত জনসমুদ্রে যেন ভেসে চলল। লক্ষ লক্ষ ফুলের মালা আর গীতা বর্ষিত হতে লাগল। ফুল, চন্দন, বেলপাতাও বাদ গেল না। সে এক অভিনব দৃশ্য। শোনা যায় নরেন গোসাইর মৃত্যুর খবর যেদিন প্রকাশিত হয়েছিল সেদিন লোকে পথে পথে (কেউ কেউ আবার উলঙ্গ হয়ে!) নৃত্য করেছিল, সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পত্রিকা 'Bengalie' অফিসে বসে সন্দেশ বিতরণ করেছিলেন। আজ আবার এক নূতন উন্মত্ততায় দেশ ভরে গেল। কানাইলাল আর সত্যেন্দ্রর মূর্তি গড়ে ছেলেরা পূজো পর্যন্ত করেছিল।

দাহ কার্য শেষ হতে বিকেল পড়ে এল। চন্দন কাঠে আর ঘিয়ে শ্মশান ভরে গেছে। কলসী কলসী জল ঢেলে

চিতা নির্বাপিত হল। লোকের চাপে অস্থি খুঁজে পাওয়া গেল না। অগত্যা সামান্য একটু ভস্ম গঙ্গায় দিয়ে নিয়ম রক্ষা হল। হাজার হাজার লোক কেউ সোনার, কেউ রূপোর, কেউ হাতীর দাঁতের কৌটা করে কিছু ভস্ম বাড়ী নিয়ে গেল।

আজ শ্মশান দেশে নতুন করে রঙ লেগেছে। প্রাণের জোয়ারে আজ সারা ভারত উদ্বেল। সেদিনকার সেই শ্মশান-যাত্রীরা এতদিনে বুঝি গৃহে ফিরল।